সোণার-তরী সিরিজ

কুম্ভকর্ণের সুপ্ত পুরী

শ্রীফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়

প্রাপ্তিস্থান—
বিশ্বনাথ পাবলিশিং হাউস্
৮নং শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

দাম এক টাকা

শুভ জন্মাষ্টমী
১৩৫১ সাল

২৩নং ডিক্সন লেন, কলিকাতা 'উদয়াচল কার্য্যালয়ের' পক্ষ হইতে
শ্রীমণীন্দ্রনাথ রায় ও শ্রীতুলসী চরণ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত
এবং মণ্ডল প্রেসে অজিকুমার ব্যানার্জী দ্বারা মুদ্রিত

বাংলাভাষাভাষী কিশোর-কিশোরীদল

স্নেহাস্পদেষু

তোমাদের বাংলার শিশু-সাহিত্য যথেষ্ট উন্নতি লাভ করেছে এবং বাংলায় শিশু-পাঠকের সংখ্যাও বেড়েছে। সন্দেশ খাওয়ার চাইতে বই পড়ার দিকে আজকালকার ছেলেমেয়েদের বেশি ঝোঁক! অভিভাবকেরাও খোকাখুকুর জন্মদিনে ভালো বই উপহার দেওয়া পছন্দ করেন। আশা এবং আনন্দের কথা—কিন্তু অল্পবয়স্কদের জন্য লেখা যে-সব গল্প-উপন্যাস বাজারে দেখতে পাই, তার মধ্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সস্তা গোয়েন্দাগিরি—কাণের পাশ দিয়ে বার বার গুলী চলে গেলেও যে-বইয়ে ডিটেক্‌টিভ কিছুতেই মরে না, যে বইয়ে সামঞ্জস্যহীন ঘটনার 'থ্রিল' শিশু পাঠককে মজাদার ঘুগ্‌নীদানার মত আকর্ষণ করে—অসংখ্য রিভলভার, অজস্র যন্ত্রপাতি আর আজগুবি সব কৌশল খাটানোর বাহাদুরী দেখিয়ে রোমাঞ্চক রহস্য সৃষ্টি করা হয়—সেই রকম বই-ই বেশি! কিম্বা অরণ্য আর আদিম অধিবাসীদের নৃশংসতা—বর্ব্বর আচার ব্যবহারের কাল্পনিক বিভৎসতা দেখিয়ে শিশুপাঠককে মুগ্ধ করবার প্রয়াস থাকে। কিন্তু আধুনিক যুগের শিশু, তোমরাও ভাবতে শিখেছো। তোমরা বেশ বুঝতে পারো—গল্পটা কোথায় গাঁজাড়ে আর কোথায় ভৌতিক হয়েছে। তবু যে পড়ো, তার কারণ, পড়ার নেশাটা তোমাদের পেয়ে বসেছে!

বর্ত্তমান যুগের খোকাখুকুদের গল্প শুধু রোমাঞ্চক হলেই চলবে না—কিছু চিন্তার খোরাকও তাতে থাকতে হবে। ছেলেমেয়েদের সঙ্গে মিশে, তাদের বই পড়ার কথা শুনে আর আমার ছুএকটা প্যাঁচালো গল্প তাদের শুনিয়ে আমি বিশ্বাস করতে বাধ্য হয়েছি যে সাধারণ ডিটেকটিভ প্যাঁচ্ বা অসভ্য মানুষের আজগুবি কাহিনীকে তারা স্রেফ্ অবজ্ঞা করে—বলে, "বইটা পড়লাম—গাঁজা।" হয় অতি সহজ গল্প তারা ভালোবাসে না হয় তো চিন্তা করার মত প্লট তারা পছন্দ করে রোমাঞ্চক যে-কোনো গল্পে। আমি এই বইএর নায়ক অমরনাথের জীবনের অন্য একটা গল্প লিখে এর প্রমাণ পেয়েছি। সে বই তারা একবার পড়ে বোঝে নি—ছুবার পড়ে বুঝেছে এবং তিনবার পড়ে প্রচুর আনন্দ পেয়ে আমাকে কেউ কেউ নানা প্রশ্ন করে চিঠি লিখেছে ঐ বই-এর বৈজ্ঞানিক কৌশল সম্বন্ধে!

বর্ত্তমান উপন্যাস "কুম্ভকর্ণের সুপ্ত পুরী"—বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে লেখা! যে-সব চিন্তাশীল শিশুপাঠক ব্রেণ খাটিয়ে বই পড়তে চায় এবং পড়ে ভাবতে চায়—এ বই তাদেরই জন্য! কতকগুলি এঞ্জিনিয়ারিং কৌশল—একটু চিন্তা করলেই যেটা ছেলেমেয়েরা বুঝতে পারবে—তাই অবলম্বন করে এই রোমাঞ্চক ডিটেক্টিভ উপন্যাসটি লেখা হোল। এর মধ্যে গোয়েন্দার কাণের পাশ দিয়ে গুলি চলে নাই—পনেরোটা লোককে জখম করে ডাকাত পাঁচতলার ছাদ থেকে লাফ দেয় নাই—এমন কি, সাধারণ একটা দাঙ্গাহাঙ্গামাও হয় নাই। এ সব কিছু না হলেও এটা রহস্যময় উপন্যাস—এবং এর রহস্য আবিষ্কার করতে একজন

বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক গোয়েন্দাকে সাতঘাটের জল খেতে হয়েছে। যারা এ বই পড়বে—তারা যেন একটু চিন্তা করে পোড়ো—নিজেকে ডিটেক্‌টিভ মনে করে পোড়ো। তোমাদের ভালো লাগলে এই রকম বই আরো কয়েকখানা আমার লিখবার ইচ্ছে আছে। ইতি

১১ই, আরপুলি লেন
কলিকাতা

স্নেহাশীর্ব্বাদক
ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়

কুম্ভকর্ণের সুপ্ত পর্ব

শ্রীমান অমরনাথ বাজপেয়ী—লোকে বলে "বাজপাখী"। কেন বলে সে-কথা তোমরা অবিলম্বে জানতে পারবে আর তোমরাও তাকে "বাজপাখীই" বলবে।

অমরনাথের পূর্ব্বপুরুষগণ এই গ্রামের বড় রকম জমিদার ছিলেন—এখন অবশ্য ছোট-বড় কোন জমিদারি থাকা দূরে থাক্ বাস্তু ভিটে আর বিঘে দশ জমি ছাড়া আর কিছু আছে বলে জানা নেই।

তবে হাঁ, ভিটে বটে! সে একখানা দেখ্‌বার মত বস্তু। প্রায় বিঘে পঞ্চাশ জায়গা জুড়ে পুকুর, বাগান সমেত তিন মহল্লা ভিটে, বাদুড়-চামচিকেতে বোঝাই, ঝোপ-জঙ্গলে একাকার, সাপের ডিপো। তথাপি দেখবার মত। এখনো তার ভাঙা দেওয়ালের পোড়ামাটির ছবি, কার্ণিশের উপরের চুণবালির নক্‌সা বা বড় বড় হলঘরের খিলানের কাজ দেখলে তোমার আশ্চর্য্য লাগবে। কুম্ভকর্ণের সুপ্ত পুরী।

এই প্রকাণ্ড বংশের শেষ বংশধর অমরনাথ;—পাছে মরে যায়, তাই যেন ওর মা-বাবা অমরত্বকে জড়িয়ে দিয়েছেন ওর নামের সঙ্গে।

ওর মা-বাবার বিশ্বাস, ছেলে তাদের বংশের সপ্তম পুরুষ ; অতএব এই প্রাচীন বংশের পূর্ব্ব গৌরব সেই ফিরিয়ে আনবে, অবশ্য যদি বেঁচে থাকে। এহেন অমরনাথ পরীক্ষায় ফেল করে গেল—নিতান্ত ছোট পরীক্ষা, ম্যাট্রিকুলেশন মাত্র। সব আশা-ভরসা গেল তলিয়ে।

কিন্তু অমরনাথ মা'কে গিয়ে বলল—আমি ভেবে দেখলাম, পড়বার কিছু দরকার নেই—জজ্-ম্যাজিষ্ট্রেট হবার জন্য জন্মাই নি—আমাকে তোমরা আর পড়্তে বলো না।

—কী করতে চাও তুমি তাহলে ? প্রশ্ন করলেন মা।

—এক মাসের মধ্যে বলব—বলেই অমরনাথ বেরিয়ে গেল।

সহপাঠিদের যারা পাশ করেছে তারা কলেজে পড়বে,—তৈরী হচ্ছে। ফেলের দলে একা অমরনাথ। কোন কাজ না থাকায় তার হঠাৎ খেয়াল জাগল, তাদের বিশাল বাড়ীর কোথায় কি আছে, ভাল করে দেখ্তে হবে। চাই-কি কোথাও কোনো গুপ্ত ধনের সন্ধানও তো মিলতে পারে। অমরনাথ একটা কাটারী আর একটা শাবল হাতে বেরিয়ে পড়ল ভাঙা ভিটে তদারক করতে।

ঈশান কোণের দিকেই প্রথম গেল অমরনাথ। এই দিকটাতেই নাকি ধনাগার ছিল। যখন ছিল, তখন হয়ত সিপাহী, শান্ত্রীতে গম্‌গম্ করতো সেদিকটা। আজ কিন্তু একেবারে নিচালি ; নিস্তব্ধ দুপুরে একটা পায়রা শুধু কোন্ কার্ণিশের কোণায় বসে ডাক্‌ছে—বক্-বকম্।

অমরনাথ এসে দাঁড়াল প্রকাণ্ড একটা চত্তরে। ইটকাঠ

ভেঙে পড়েছে—ভিতরে যাবার রাস্তা নেই, কিন্তু সে দেখ্‌লে তো চলবে না। কে যেন অমরনাথের কানে কানে বলছে—অন্ততঃ সাত ঘড়া মোহর পোতা আছে এই ধনাগারে। সেগুলো বার করতে পারলেই ল্যাঠা চুকে যায়—পড়বার দরকার তো হবেই না—উপরন্তু চড়ো মোটরগাড়ী, চলো কাশ্মীর, চালাও এন্তার…! খুসীতে অমরনাথ হাই তুললো একটা।

বিরামহীন ইটকাঠ পাথর পড়ে আছে। অমরনাথ ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে যতটা সম্ভব অগ্রসর হোচ্ছে। কোথাও যদি এখনি ফোঁস করে ওঠে! ভয়ও পাচ্ছে খুব, কিন্তু পরীক্ষায় ফেলই যখন হয়েছে তখন বেঁচে কি লাভ! যা থাকে কপালে!

শেষ পর্য্যন্ত একটা ঘরের সুমুখে এল অমরনাথ। দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ। খোলা যাবে কি করে! শাবল দিয়ে মারল ধাক্কা। জীর্ণ দরজা গোটা পাঁচ সাত আঘাতে ভেঙে পড়ল। জয় মা কালী—ঘরের মধ্যে একটা মস্তবড় সিন্ধুক, একেবারে দেয়ালের গা-ঘেঁসে। উল্লাসে চীৎকার করে উঠতো অমর কিন্তু কী আছে ওর মধ্যে না দেখে তো আনন্দ প্রকাশ করা চলে না। আস্তে, অত্যন্ত সাবধানে ঘরে ঢুকলো সে—যেন কেউ কোথাও দেখে ফেলবে। অথচ এখান থেকে প্রাণপণে চেঁচালেও কেউ শুনতে পাবে না—জায়গাটা এতই নির্জন আর বস্তী থেকে দূরে।

সিন্ধুকটা বহুদিন থেকে বন্ধ—শাবলের চাড় দিয়ে ডালাটা খুলতে চেষ্টা করল অমরনাথ। নাঃ, প্রায় আধঘণ্টা পরিশ্রম করে ক্লান্ত ঘর্মাক্ত হয়েও কিছু হোল না। সিন্ধুকটা পাথরের;

কাঠের হলে না হয় ভেঙে ফেলতো। কী এখন করা যায়? ঐ সিন্ধুকের উপরেই বসে ভাবতে লাগল অমরনাথ—কি উপায়ে খোলা যায় ওটা।

হঠাৎ তার মনে হোল, কোন রকম গুপ্ত কল থাকতে পারে ওটা খুলবার। তৎক্ষণাৎ নেমে সিন্ধুকের তিন পাশ খুঁজতে লাগল। কিন্তু বৃথা—কোনদিকে কিছু চিহ্ন নেই, সব মসৃণ—চাবিরও কোন গর্ত্ত দেখতে পেলো না অমরনাথ। প্রায় নিরাশ হয়ে পড়েছে—ফিরবে কি না ভাবছে, অকস্মাৎ তার নজর পড়ল দেওয়ালের গায়ে একটা লোহার ডাণ্ডা, ঠিক আলনার মত সোজা বেরিয়ে এসেছে। ওটা কি জন্যে ওখানে? অমরনাথ সিন্ধুকটার উপর চড়ে ডাণ্ডাটা ধরে সামনের দিকে টানলো, নড়ে না যে। নীচের দিকে টানলো, তবুও নড়ে না—উপর দিকে তুললো—হঠাৎ তার পায়ের তলায় সিন্ধুকের ডালাটা নড়ে উঠলো। একি ব্যাপার! এই ডাণ্ডাটাই কি ওর চাবি নাকি! সিন্ধুকটা মস্ত বড়—ডালাটার মাঝখানে মাত্র হাত দেড়েক লম্বা-চওড়া চৌকো। একপাশে সরে এসে অমরনাথ ডাণ্ডাটা উপর দিকে ঠেলতেই সিন্ধুককের ডালাটা দিব্যি খুলে এল। আনন্দে-বিস্ময়ে অমরনাথ সিন্ধুকটার ভিতর কি আছে দেখতে চাইল, কিন্তু প্রকাণ্ড সিন্ধুকটার গর্ভ একদম অন্ধকার। একটা টর্চ্চ আনলে ভাল হোত। কিন্তু ফিরে গিয়ে টর্চ্চ আনবে, এতখানা ধৈর্য্য আর নেই তার। "জয় মা কালী" বলে অমরনাথ নেমে পড়ল সেই সাত হাত লম্বা, চার হাত চওড়া, তিন হাত উঁচু সিন্ধুকটার মধ্যে।

সিন্ধুকের মধ্যে ঢুকেই উবু হয়ে বসে যেমন সে হাতড়ে

দেখতে যাবে কী আছে ওর মধ্যে, ওমনি ঝড়াং করে উপর থেকে পাথরের ডালাটা পড়ে সিন্ধুক বন্ধ হয়ে গেল। দুর্ভাগা অমরনাথ বন্দী তার সাত পুরুষের ভিটেয়। এক ক্ষুধিত সিন্ধুক তাকে গর্ভে গ্রাস করে নিল।

ভয়ে ভাবনায় কেঁদে উঠল অমরনাথ। কিন্তু কে শুন্‌বে তার কান্না! কামান দাগ্‌লেও সেখান থেকে আওয়াজ বাইরে আসবে না। শরীরের রক্ত ওর ঝিম্‌ঝিম্‌ করছে। ভয়ে প্রায় দশ মিনিট কাঠের মত হয়ে রইল সে, তারপর প্রাণপণ চেষ্টায় ডালাটা নীচে থেকে চাড় দিয়ে তুলবার চেষ্টা করতে লাগল! কিন্তু সে ডালা যেন হিমাচলের মত অটল হয়ে বসে গেছে। না, উদ্ধারের কোন উপায় নেই আর। মা-বাবা, বোন হীরু খেলার সাথীরা—সব পড়ে রইল, জীবন্ত কবর হয়ে গেল মৃত্যুহীন অমরনাথের—, অদৃষ্ট!

কিন্তু মানুষ কি আর সহজে মরতে চায়? আর একবার প্রাণপণ চেষ্টা করবে অমরনাথ। মনে হোল—দেওয়ালের গায়ের ঐ ডাণ্ডাটার সঙ্গে সিন্ধুকের ভিতরের কলের যোগ আছে—কোথায় সে যোগ, বার করতে হবে। ভিতরের চারপাশের দেওয়াল হাত্‌ড়াতে লাগল অমরনাথ। "জয় মা কালী," একটা কড়া হাতে ঠেকল। উপর দিকে, নীচের দিকে, পাশের দিকে, নানারকমে টানাটানি করতে লাগল সে কড়াটা ধরে, কিন্তু কিছুই সুবিধা হোল না,—আর কতক্ষণই বা সে এইটুকু সিন্ধুকের মধ্যে বাঁচবে! হাওয়া বিষাক্ত হয়ে

উঠবে, আর অমরনাথ এখুনি অজ্ঞান হয়ে যাবে। আর একবার গা-টা তার ঝিম্‌ঝিম্‌ করে উঠল। নিদারুণ নিঃশব্দ অন্ধকার, মৃত্যু যেন ওর কাছে দাঁড়িয়ে। কড়াটাতে হাত রেখেই সে ভাবছিল, মাথাটা তার এলিয়ে পড়ল সেই কড়ার উপরে। হঠাৎ ভিতর দিকে যেন দেওয়ালটা সরে গেল। চমকে উঠল অমরনাথ। আরো একটু জোরে ভিতর দিকে চাপ দিতেই সিন্দুকের দেওয়ালের খানিকটা যেন ইটের দেওয়ালের মধ্যে চলে গেল, আর সেখানে বেরিয়ে পড়ল একটী ছোট দরজা। অন্ধকারে হাত্‌ড়ে অমরনাথ বুঝতে পারলে, সিন্ধুকের ভিতরেই অন্যত্র যাবার পথ এটা। ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করে সে হামাগুড়ি দিয়ে সেই ভিতরের পথে ঢুকে পড়ল। সিঁড়ি রয়েছে মনে হোল। সিঁড়ির উপর আস্তে পা ফেলে সাবধানে উঠতে লাগল অমরনাথ। সিঁড়িটা এতই অপ্রশস্ত যে দুপাশের দেওয়াল গায়ে লাগে! তবু অমরনাথ উঠতে লাগল। সিঁড়িটা যেন একটা চওড়া দেওয়ালের মধ্যে করা হয়েছে। এ যে একটা গুপ্ত ঘর, এতে আর সন্দেহমাত্র নেই। আশায় উৎফুল্ল হয়ে উঠল অমরনাথ। এখান থেকে একবার বেরুতে পারলে ইহ জীবনে আর নয়—বাব্বা! প্রায় পঞ্চাশ হাত উঠেও অমরনাথ কুল পেলে না। এ যেন ঠিক পাহাড়ে উঠা। কিন্তু উপায় যখন নেই আর কিছু—থেমে থেমে চলতে লাগল। আরো অনেকটা উঠে অমর এমন একটা জায়গায় এল, যেখানে সিঁড়ি শেষ হয়ে গেছে; অথচ সুমুখে দেওয়াল। বাইরে যাবার কোন রাস্তা নেই।

অন্ধকারে যতটা সম্ভব হাত্ড়ে কোন পথই পেল না অমরনাথ। এ সিঁড়ি দিয়ে তা'হলে কি উপকার হবে? কষ্ট করে ওঠাই সার হোল। ক্লান্তিতে সর্ব্বাঙ্গ তার অবশ হয়ে উঠেছে,বসে পড়ল অমরনাথ সেই সিঁড়ির উপর।

হয়তো ঘুমিয়েই গিয়েছিল,—এক ঝলক হাওয়া গায়ে লাগতেই চোখ মেলে দেখল—কিছুই দেখা যায় না। ধীরে ধীরে সবটা মনে পড়ল। এখন দিন না রাত্রি? কে জানে কতক্ষণ সে বন্দী এখানে।

কিন্তু হাওয়া কোন্ দিক থেকে আসছে? নিশ্চয়ই কোন পথ আছে, অন্ততঃ হাওয়া আসবার মত পথ। অমরনাথ হাওয়ার গতিটা বুঝবার চেষ্টা করতে লাগল। হাওয়া যেন নীচের দিক থেকেই আসছে কিন্তু নীচের দিকে তো সেই মারাত্মক সিন্ধুক! ভেবেই পেলনা সে, কি করবে। খিদেতে নাড়ী পর্য্যন্ত জ্বালা করছে। আর বেশিক্ষণ এভাবে থাকলে নিশ্চয় মারা যাবে। উঠলো সে আবার—আস্তে আস্তে যে-পথে উঠেছিল সেই পথেই নামতে শুরু করল। এবার কিন্তু সে দুপাশের দেওয়ালে হাত বাড়িয়ে হাত্ড়ে হাত্ড়ে আসতে লাগল, যদি কোথাও কোন ছিদ্র পায়, এই আশা।

প্রায় বিশ পঁচিশ হাত নেমেছে—হাওয়াটা বেশ জোর এসে গায়ে লাগল। এই খানেই নিশ্চয় কোথাও ঘুলঘুলি কিম্বা জানালা আছে, ভাল করে অনুভব করতে লাগল অমরনাথ হাওয়ার গতি। হাঁ, বাঁদিকে কয়েকটা বাঁকানো ঘুলঘুলি, বাইরের কিছু দেখা যায় না কিন্তু হাওয়া আস্ছে। হাত দিয়ে

দেখলো, বার চৌদ্দ ইঞ্চি দীর্ঘ প্রস্থ তিনটে ঘুলঘুলির ভেতর দিয়ে হাওয়া আসছে, কিন্তু ওপথে তো আর মানুষ বের হতে পারে না। চীৎকার করলে যদি কেউ শুন্‌তে পায়, এই আশায় অমরনাথ গোটাকয়েক গগনভেদী ডাক দিল, কিন্তু কোথায় কে,! কোনো সাড়া শব্দ নেই কোনো দিকে।

এতক্ষণ নিশ্চয় রাত্রি হয়েছে বাইরে। মা-বাবা খুঁজছেন, আর হীরু কাঁদছে! ওঃ; অমরনাথ তার লোভের প্রায়শ্চিত্ত করলো মৃত্যুতে। বেরোবার কোনো উপায়ই আর নেই তাহলে, হাঃ ভগবান!

পিপাসায় গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে উঠেছে, খিদেতে শারীরিক দুর্ব্বলতা অনুভব করছে অমরনাথ। মৃত্যুর মুখোমুখী এমন ভাবে দাঁড়িয়ে থাকা কি ভয়ঙ্কর? তা অনুভব করাও কষ্টসাধ্য। অমরনাথ নিরাশ হয়েও হাতপাগুলোকে একটু টান করবার চেষ্টা করল। যেখানে সে দাঁড়িয়ে আছে সেখানকার ছাদ্‌টা খুব নীচু। হাতখানা উপরদিকে তুলতেই ছাদের শিলিংএ হাত ঠেকলো, বিস্মিত অমরনাথের হাতে ঠেকলো ছাদ-সংলগ্ন একটা লোহার কড়া। কড়াটা ধরে যেই-না সে একটু টান দিয়েছে ওমনি ক্রীং করে একটা শব্দ, পরক্ষণেই অমরের পায়ের নীচেকার দু'তিনটা সিঁড়ি কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল, অমরনাথ ঝুল্‌তে লাগলো শূন্যে! হা ঈশ্বর! যদি বা সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে থাকলে কোন উপায় হোত, এখন তো একদম নিরুপায়! নিরবলম্ব অমরনাথ দুপাশের দেওয়ালে পা রেখে কড়াটা ছাড়বার চেষ্টা করল, কিন্তু দেওয়াল

এতো পিছল যে পা পিছ্‌লে যায়। কড়াটা ছাড়লে সিড়িটা হয়তো বেরিয়ে আসতে পারে কিন্তু কড়া ছাড়লেই যে সে কোন্ অতল গর্ত্তে গিয়ে পড়বে, কে জানে? যতক্ষণ সাধ্য. নানা চেষ্টা করল অমরনাথ, কিন্তু সব বৃথা। সিড়ি আর বেরুল না। গর্ত্তটা কতখানি, কড়াটা ছাড়লে কোথায় গিয়ে পড়বে সে, কিছুই জানা নেই—তবুও কড়া ধরে আর বেশিক্ষণ ঝুলে থাকা অসম্ভব। "জয়মা কালী" বলে অমরনাথ দিল কড়াটা ছেড়ে। সঙ্গে সঙ্গে পাতাল প্রবেশ হয়ে গেল তার; কোথায় কোন অতল গহ্বরে পড়ে রইল অমরনাথ অজ্ঞান হয়ে।

ভোর হতে তখনো দেরী আছে—ডিটেকটিভ মিঃ অরবিন্দ শিকদার গতরাত্রে একটা বড়রকম রহস্যের কিনারা করে অনেক রাত্রে বাড়ী ফিরে নিশ্চিন্ত মনে ঘুমিয়েছেন। হাতে যে দুএকটা ছোট কাজ আছে, সেগুলো ধীরে সুস্থে সারবেন—বাড়ীর লোকরাও অনেকদিন পরে কর্ত্তাকে বিশ্রাম করতে দেখে খুসী হয়েছে।

অরবিন্দ বাবুর প্রকাণ্ড বাড়ীর ফটকে এসে দাঁড়ালেন অমরনাথের বাবা। গতকাল তাঁর ছেলে চুরি হয়ে গেছে। এত সকালে চাকরেরাও উঠে নি। মালি শুধু বাগানের মেহেদি গাছগুলো সমান করে ছাঁটছিল। অমরের বাবা তাকেই করুণ ব্যগ্রতা জানিয়ে অরবিন্দ বাবুকে খবর দিতে বললেন।

বেলা সাতটা নাগাদ অরবিন্দ বাবুর সঙ্গে দেখা হোল। সব শুনে তিনি বললেন—আপনার ছেলেটি কী এমন রত্ন মশাই যে ডাকাতে চুরি করবে? পরীক্ষায় ফেল হয়েছে, কোথায় মামার বাড়ী না হয় মাসির বাড়ী লুকিয়ে আছে, খোঁজ করুন গিয়ে। এ আবার একটা কাজ নাকি যে সকালে বিরক্ত করতে এসেছেন!

অমরের বাবা একেবারে অরবিন্দ বাবুর পা জড়িয়ে ধরে বললেন, ছেলে তাঁর রত্নই—কারণ সে তাঁর বংশের সপ্তম পুরুষ এবং সেই তাঁর পিতৃপুরুষগণের নাম অক্ষয় করবে।

—কিন্তু চোর ডাকাত কি করবে তাকে নিয়ে? প্রশ্ন করলেন মিঃ শিকদার!

—কোথায় তাহলে যাবে আর ছেলেটা? সব জায়গাই তো খোঁজা হয়েছে। একবার চলুন অরবিন্দদা একঘণ্টার পথ—এই নয়টার ট্রেণে গিয়ে বিকালে যখন ইচ্ছে ফিরতে পারবেন।

মিঃ শিকদার বিশ্রাম চাইছিলেন। অনেকদিন পাড়াগাঁয়ে যান নি; তার উপর ব্যাপারটাও বেশ মজার। পরীক্ষায় ফেল করে ছেলে বাড়ী থেকে পালালো, আর বাবা এসেছে ডিটেকটিভের কাছে ছেলেকে খুঁজে বার করবার জন্য। যাই হোক, যাওয়া যাক না একবার।

নটার ট্রেণেই রওনা হলেন তিনি অমরের বাবার সঙ্গে। মনে মনে তাঁর হাসি পাচ্ছে। ভাবছেন, এই রকম একটা ছোট ব্যাপারের কিনারা করতে তাঁর মত বিখ্যাত ডিটেক্‌টিভের যাওয়া উচিত নয়। হয়তো অমরনাথ এতক্ষণ ফিরে এসেছে।

অনর্থক যাওয়া। কিন্তু শেষটায় আসতেই হোল তাঁকে। কারণ বাজপেয়ী মশায় দূরসম্পর্কে মিঃ শিকদারের আত্মীয়। কুটুম্বের আহ্বান প্রত্যাখ্যান করতে পারলেন না তিনি। তাছাড়াও আর একটা গুপ্ত উদ্দেশ্য ছিল—সময়ে সেটাও প্রকাশ পাবে।

ষ্টেশনে নেমে বাড়ী মিনিট পনেরর পথ। হেঁটেই চলে এলেন। সমস্ত সন্ধান নিয়ে জানলেন, বাড়ী থেকে অমরনাথকে কেউই বেরুতে দেখে নি। ফেল হওয়ার জন্য কেউ বকাবকিও করেনি—অর্থাৎ পালিয়ে যাবার কোন কারণই ঘটেনি। কী হোল তাহলে ?

অমরনাথ যে ঘরটায় পড়াশুনো করতো, সেই ঘরে গেলেন মিঃ শিকদার। সব যেখানকার যা সেইখানেই আছে। শোবার ঘরও এইটাই। বিছানা-বালিশের তলায় যদি কোন চিঠি থাকে, ওলোট-পালট করে খোঁজা হোল—গেল কোথায় তাহলে ? হাওয়া হয়ে উড়ে তো যাবে না !

মাঝে মাঝে অমরনাথ প্রাণায়াম অভ্যাস করতো ছাদের একটা ছোট্ট কুঠরিতে বসে—তার মা বললেন। মিঃ শিকদার সেখানটাও তন্নতন্ন করে খুঁজলেন। নাঃ, কোথাও কোন হদিস মিললো না।

বেলা এগারোটা নাগাদ স্নান করে খেতে বসলেন মিঃ শিকদার। মাঝে মাঝে ভাবছেন, কোথায় গেছে হয়তো পালিয়ে, দু'একদিনের মধ্যে ফিরবে, না হয় চিঠি দেবে। ভাবনার কি আছে এমন ? কিন্তু ওর মা কেঁদে ভাসিয়ে দিচ্ছেন, আর হীরু ওর বোন, সে কাল থেকে একবারও চুপ করেনি !

মিঃ শিকদার খাচ্ছেন আর ভাবছেন। অমরের মা খেতে দিচ্ছেন, অমরের বাবাও বসেছেন খেতে, কিন্তু খাওয়ায় কি আর রুচি আছে তাঁদের! নেহাৎ না খেলে নয় তাই বসেছেন।

এই বাড়ীর প্রাচীন ইতিহাসের কথা মিঃ শিকদারের জানা—বাড়ীটা ভয়ঙ্কর রকমের পুরানো আর চোরাকুঠরীতে ভরা, তাও জানতেন তিনি—কিন্তু খুব বেশি বুদ্ধিমানরা অনেক সময় খুব কাছের ভুল ধরতে পারেন না। অমরনাথ চুরি হয়ে গেছে—কিম্বা পালিয়ে গেছে, এই ধারণাই বদ্ধমূল রইল। সে যে এই প্রকাণ্ড বাড়ীর কোথাও বন্দী হয়ে পড়তে পারে, এটা ওঁরা কেউ ভাবলেনই না।

খাওয়ার পর বিশ্রাম করতে করতে মিঃ শিকদার ভাবতে লাগলেন, ছোঁড়াটা কোথায় গেল, কি করে গেল! খুঁজে তাকে বার করতেই হবে—নইলে মিঃ শিক্‌দারের এতকালের সুনাম কলঙ্কিত হবে যে!

গাঁয়ের ষ্টেশন মাষ্টার বলেছে, রেলের টিকিট কেনা দূরে থাক্, ষ্টেশনেই আসে নি অমরনাথ। অতএব হাঁটা পথে কোথাও গেছে। দিনের বেলা, দুপুরের খাওয়া খেয়ে সে হারিয়েছে, সে-সময় চোর ডাকাতের তাকে অপহরণ করা অসম্ভব। যাই হোক—মিঃ শিকদার শেষটায় মাটিতে পদচিহ্ন খুঁজতে আরম্ভ করলেন। পাকা শানের পুরানো মেঝেতে খালি চোখে পদচিহ্ন খুঁজে পাওয়া অসম্ভব। কুকুর আনিয়ে গন্ধ শোঁকাবেন নাকি মিঃ শিকদার? চিন্তায় অস্থির হয়ে উঠলেন তিনি। উত্তেজনাও জাগতে লাগল। চিরটা কাল

চোর ডাকাত ধরে আজ কি না একটা ছেলেকে তিনি খুঁজে বের করতে পারবেন না! নাঃ, এ হতে পারে না। মিঃ শিকদার উঠে পড়লেন উত্তেজিত হয়ে।

বেলা তখন প্রায় একটা। অমরনাথের বাবা-মা ছেলের শোকে শয্যা নিয়েছেন। হীরু তো ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও ফুঁপিয়ে উঠ্ছে। মিঃ শিকদার একাই বেরুলেন সেই বিশাল বাড়ীটার চার পাশ ঘুরে দেখতে; যদি কোথাও কোন সূত্র পাওয়া যায়।

হয়তো অমরনাথকে মুখে রুমাল চেপে বন্দী করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, কিম্বা ক্লোরোফর্ম করে দেওয়া হয়েছে কিম্বা, —কত কী মাথামুণ্ডু ভাবছেন মিঃ শিকদার আর চল্ছেন।

কিন্তু কী স্বার্থ চোর-ডাকাতের থাকতে পারে অমরনাথকে চুরি করে! এই পুরানো ভিটে আর বিঘে দশ খানি জমি ছাড়া অমরনাথের বাবার কিছু নেই। অমরনাথই অবশ্য তার উত্তরাধিকারী কিন্তু সেটা কিছু লোভনীয় নয় এমন, যার জন্য তাকে গুম্ করা হবে। অমন নিরেট বোকা চোর কেউ নেই।

মিঃ শিকদার অকস্মাৎ থেমে গেলেন। অন্তঃপুরের উঠানের বনতুলসীর বনটা কে যেন মাড়িয়ে গেছে—আজই হয়ত, কিম্বা গতকাল! চললেন মিঃ শিকদার সেই বনতুলসীর ডাল ভাঙা পথের চিহ্ন ধরে। মিনিট পাঁচের মধ্যে এসে পড়লেন সেই চত্তরটায় আর দেখতে পেলেন একটা শাবল পড়ে রয়েছে। নিশ্চয়ই অমরনাথ এটা রেখে গেছে। দুই লাফে তিনি এসে দাঁড়ালেন ঘরটার মধ্যে সেই পাথরের সিন্দুকটার কাছে।

সিন্ধুক আর তার চারপাশের অবস্থাটা দেখে বুঝলেন, এখানে যে এসেছিল সে ঐ অমরনাথ, কিন্তু গেল কোথায় সে ?

তবে কি এই সিন্ধুকটার মধ্যেই ঢুকে আর বেরুতে পারে নি ! চট্ করে মাথার মধ্যে বুদ্ধির বিদ্যুৎ খেলে গেল তাঁর। অতঃপর সিন্ধুকটা খোলার চেষ্টা চলতে লাগল। না ঃ অসম্ভব। কিছুতেই খোলা গেল না। হাত ঘড়িতে দেখলেন মিঃ শিকদার, বেলা প্রায় তিনটা।

নিরাশ হয়ে ফিরে আসছেন তিনি—মনে হোল, এই ঘরটার বাইরে কোন্ যায়গাটা ঠিক পড়ে, একবার দেখা যাক্। ছোট্ট একটা জানালা ছিল একধারে। এগিয়ে গিয়ে দেখলেন, খিড়কীর প্রকাণ্ড পুকুরটার বাঁধান ঘাটটার ঠিক উপরেই ঐ ঘরটি। ঐ দিকে দরজা থাকলে, খুলেই পুকুরঘাটে যাওয়া যেতে পারতো।

মিঃ শিকদার আর একটু ভাল করে দেখতে চাইলেন, পুকুরের ঠিক ঘাটের উপরেই ঐ ঘরটায় ঐ পাথরের সিন্ধুকটা রাখবার কি উদ্দেশ্য হতে পারে ! বাইরের দিক থেকে ঘরটা নিতান্তই সহজগম্য, যদি দরজা থাকতো। অবশ্য দরজা নাই, তথাপি ঐ রকম যায়গাতে কেউ ধনাগার করে না। সিন্ধুকটা কি তাহলে ?

চিন্তিত মনে তিনি জানালা থেকে ফিরছেন, হঠাৎ একটা গোঙানী মত শব্দ কানে এল। ছুটে এসে সিন্দূকটার গায়ে কান পাতলেন—না, এখানে কোন শব্দ পাওয়া যায় না। আবার গিয়ে জানালায় দাঁড়ালেন। গোঙানিটা যেন ঐ বাঁধানো ঘাটের দিক থেকেই আসছে। কী সর্ব্বনাশ ! অমরনাথ

ওখানে গেল কি করে? শাবলটা হাতে নিয়ে ছুটে বেরিয়ে এলেন মিঃ শিকদার। একটা ভাঙা পাঁচিল টপকে এলেই ঘাটে যাওয়া যায়। পুকুরটার তিনটে ঘাট। মাঝ খানেরটায় অমররা স্নানাদি করে, এটা উত্তরদিকের, বহুদিন অব্যবহার্য্য থাকায় জঙ্গল হয়ে গেছে। বড় বড় পাথর চারকোনা করে কেটে বাঁধান হয়েছিল, পাথরগুলো এখন আলগা হয়ে গেছে, ফাটল ধরেছে তাদের জোড়ে জোড়ে আর গজিয়ে উঠেছে আগাছা।

পাঁচিলটা ডিঙিয়ে সিকদার মশাই ঘাটের উপর এসে পড়লেন। হাঁ, গোঙ্রানি স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে এবার। মানুষেরই গোঙ্রান। কিন্তু কোথায়? পাথর বাঁধান ঘাটে যে দুচার বছর কেউ এসেছে, এমন কোন প্রমাণ নেই। অথচ শব্দটা আসছে ঐ পাথরের ভিতর থেকেই। প্রত্যেক ফাটলে কান পাততে লাগলেন শিকদার মশাই। দু'পাশের রোয়াকের পাথরগুলো একটু বড় আর চওড়া। উত্তরদিকের রোয়াকের মাঝ-বরাবর একটা পাথরের কাছে আসতে তাঁর মনে হোল, গোঙানিটা যেন এইখানেই—এই পাথরের তলা থেকেই বেরুচ্ছে। হাতের শাবলটা দিয়ে পাথরটাকে চাড় দিয়ে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করতে লাগলেন শিকদার মশাই। অনেক চেষ্টাতেও কিন্তু পাথরটা একটুও নড়ানো গেল না।

আর বেশীক্ষণ অপেক্ষা করা উচিত নয়—যদি অমরনাথ ঐখানেই থাকে তাহলেও বেঁচে থাকবার কোন উপায় থাকবে না এরপর। লোকজন ডেকে তাড়াতাড়ি পাথরটা ভেঙে সরিয়ে ফেলবার জন্য তিনি ফিরবার পথে পা বাড়িয়েছেন—কে

যেন "বাবাগো"—বলে উঠলো। নিশ্চয়ই অমরনাথ। আর দেরী করা চলে না। মিঃ শিকদার শিকারীর দৃষ্টিতে আর একবার পাথরটার চার পাশ দেখে নিয়ে ঘাটটারও চারপাশ দেখে নিতে চাইলেন। যে পাথরটাকে নিয়ে কথা, তার পরের পাথরটা কিন্তু আয়তনে অসম্ভব রকম ছোট—যেন সামঞ্জস্যহীন হয়ে পড়েছে, আর তার মাঝখানে একটা কুলুঙ্গি। পূর্ব্বে হয়ত এখানে সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বালা হোত, তার ধোঁয়ার দাগ এখনো লেগে রয়েছে। ওটাতে ঐ কুলুঙ্গি করবার জন্য ছোট পাথর দেওয়া হয়েছে ভেবে ফিরতে গিয়েও মিঃ শিকদারের ডিটেকটিভ বুদ্ধি ওটাকেও একটু দেখে নিতে চাইল। কুলুঙ্গিটায় হাত দিয়েই মিঃ শিকদার বুঝতে পারলেন, পাথরটা পাথর হলেও কুলুঙ্গিটার মেঝে পিতল দিয়ে বাঁধান। মাঝখানে একটা মোটা পিন দিয়ে পিতলের চাদর আটকে দিয়েছে। ঐ পিনটাই দেরকোর মত ব্যবহার করতো বোধ হয়। সেটাকে ধরে মিঃ শিকদার ঘোরাতে চেষ্টা করলেন, ঘুরলোনা। টানতে চেষ্টা করলেন, নড়ল না, নীচের দিকে চাপ দিলেন, একটু যেন ভেতর দিকে ঢুকছে পিনটা। মিঃ শিকদার দাঁড়িয়ে পা দিয়ে জোরে চাপ দিলেন। কটাং করে পিনটা ভিতরদিকে ঢুকে গেল আর সঙ্গে সঙ্গে যে পাথরটা নিয়ে এর আগে মিঃ শিকদার এতক্ষণ ধরে ধস্তাধস্তি করছিলেন সেটা যেন দরজার মত খুলে গেল, ঝুলে পড়ল রেলের ওয়াগনের দরজার মত। বিস্মিত হয়ে মিঃ শিকদার দেখলেন, ছোট একটি দরজা বেরিয়ে পড়েছে। আর নীচে নেমেছে একটা সরু সিড়ি।

গোঙানির আওয়াজ পরিস্কার শোনা যেতে লাগল। টর্চ্চটায় ফোকাস করে মিঃ শিকদার যতটা পারেন দেখবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু খানিকটা নেমেই সিড়িটা বাঁক নিয়েছে ; বিশেষ কিছু দেখা গেল না। টর্চ্চ নিয়ে সিড়ির পথ বেয়ে নেমে পড়লেন মিঃ শিকদার।

সিড়িটা একটু সোজা নেমেই বাঁদিকে ঘুরেছে, যেন অর্দ্ধ চন্দ্রাকারে নেমে গেছে। মিঃ শিকদার ধীরে ধীরে চলতে লাগলেন, প্রায় পঁচিশ ত্রিশ হাত নামার পর সিড়িটা শেষ হয়েছে একটা সুড়ঙ্গ পথে। গোঙানির আওয়াজ এবার অতিশয় নিকট হয়ে এল। মিঃ শিকদার আশায় উৎসাহে চলতে লাগলেন। সুড়ঙ্গটা এসে শেষ হয়েছে একটা প্রকাণ্ড হল ঘরে ; ঘরটা খুব সম্ভব মাটির বিশ ত্রিশ হাত নীচে। মস্ত বড় ঘর। টর্চ্চের আলোটা এপাশ থেকে ওপাশে চালিয়ে দেখতে গিয়ে কিন্তু মিঃ শিকদারের অতিবড় সাহসী বুকও চমকে উঠল। কী সর্ব্বনাশা দৃশ্য! ঘরটায় সারিসারি সাতটি পালঙ্ক—ছোট ছোট। প্রত্যেক পালঙ্কে একটি করে নরকঙ্কাল আর প্রত্যেকের মাথার শিয়রে একটি করে ছোট লোটা,—সিঁদুর মাখানো।

লোটাগুলোতে কী আছে দেখবার ইচ্ছে হোল মিঃ শিকদারের; কিন্তু অমরনাথের গোঙানি আর শোনা যাচ্ছে না। কী হোল তাহলে? আবার অজ্ঞান হয়ে গেছে হয়তো। কিন্তু কোথায় অমরনাথের দেহখানা! তাহলে কি এই কঙ্কাল-গুলোই গোঙাচ্ছিল? বুকটা দুরুদুরু করে উঠলো একবার মিঃ শিকদারের। কিন্তু বৈজ্ঞানিক ডিটেকটিভ তিনি ; ভূতবিশ্বাস

করে কাজ মাটি করবার লোক তিনি নন। ঘর থেকে বাইরে সেই সুড়ঙ্গটায় ফিরে এলেন। গোঙানিটা আবার শোনা যাচ্ছে। কোথায় তাহলে রয়েছে অমরনাথ? প্রশ্ন করলেন তিনি নিজেকেই। শব্দটা যেন এই সুড়ঙ্গের চারদিক থেকেই আসছে। টর্চ্চ ধরে গভীর অভিনিবেশে পরীক্ষা করতে লাগলেন মিঃ শিকদার।

এই কাজে ঘণ্টা খানেকের উপর কেটেছে। ঘড়িতে দেখলেন পাঁচটা বাজে। অস্থির হয়ে উঠলেন তিনি। কাছেই কোথায় অমরনাথ রয়েছে, অথচ খুঁজে পাচ্ছেন না, একি কম আপশোষ!

বিরক্ত হয়ে তিনি আর একবার সেই কঙ্কালের ঘরটাতেই ঢুকলেন। তন্ন তন্ন করে খুঁজলেন চারিদিকে! নাঃ, কোথাও কোন ফাঁক নেই, কোন ছিদ্র নেই, নেই কিছু আশার অবলম্বন।

বেরিয়ে এসেই যাহোক কিছু একটা করা যাবে ভেবে মিঃ শিকদার সুড়ঙ্গের পথ ধরলেন। প্রায় ঘাটের কাছাকাছি এসেছেন, মনে হোল, গোঙানির আওয়াজটা যেন জোর আসছে। দাঁড়িয়ে পড়লেন। মাথার উপর খিলানের ছাদে একটা পিতলের কড়া। কিজন্য ওটা? ডান হাতে ধরে টান দিতেই পাশের দেওয়ালের একটা জায়গা ফাঁক হয়ে গেল। একটা তেমনি সুড়ঙ্গ। মিঃ শিকদার কড়াটা ছেড়ে সুড়ঙ্গে ঢুকতে যেতেই ফাঁকটা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। অর্থাৎ কড়াটায় টান পড়লেই রাস্তা খোলে আর ছেড়ে দিলেই দরজা বন্ধ হয়ে যায়। কী করে এখন ঢুকবেন মিঃ শিকদার? লোক-

জন আনতে দেরী হয়ে যাবে—অমরনাথ হয়তো মৃত্যুর কাছাকাছি এসে পড়েছে। চট্‌করে বাইরে এসে তিনি একটা ভারি পাথর তুলে নিলেন, সেটাকে ভেতরে নিয়ে গিয়ে কড়াটার সঙ্গে দড়ি দিয়ে বেঁধে ঝুলিয়ে দিলেন। দরজাটা ফাঁক রইল। মিঃ শিকদার ঢুকলেন এবার দ্বিতীয় সুড়ঙ্গের ভিতর।

খানিকটা এসেই বুঝতে পারলেন, তিনি ক্রমাগত নীচের দিকে নামছেন; সিড়ি নাই, কিন্তু পথটা ঢালু হয়ে নীচেই নেমেছে। পায়ের তলার মেঝেটা পাকা-ইটের, কিন্তু ভিজে, সোঁতা। আরো খানিকটা এসে দেখলেন—কাদায় পায়ের পাতা ডুবে যাচ্ছে। কোথায় যে যাচ্ছেন তিনি, কে জানে। সুড়ঙ্গটা সোজা নয় যে টর্চ্চ ফেলে দেখে নেবেন। আঁকাবাঁকা সুড়ঙ্গ—আলো বাধা পাচ্ছে। যাই হোক, এখানে আর থামা চলে না। আরো খানিকটা এসে তিনি একটা গোল কূয়োর মত যায়গা দেখতে পেলেন, আর দেখলেন, কাদার মধ্যে কি একটা জানোয়ার গোঙাছে। কী ওটা?

আর একটু ভাল করে দেখেই বুঝতে পারলেন—ওই অমরনাথ। তাড়াতাড়ি কাছে গিয়ে দেখলেন—আধ হাত পুরু কাদার মধ্যে অমরনাথ অর্দ্ধ-অচেতন হয়ে পড়ে আছে—গোঙাছে। উপরের দিকে চেয়ে দেখলেন, টর্চ্চের আলো প্রায় চল্লিশ-পঞ্চাশ ফুট গিয়ে একফালি ছাদে ঠেকেছে।

অমরনাথকে এখুনি বাইরের হাওয়ায় নিয়ে যাওয়া দরকার। এই বদ্ধ হাওয়ায় অনেকক্ষণ থাকার জন্য মিঃ শিকদারেরও বেশ কষ্ট হচ্ছে। কোন রকমে অমরনাথকে তুলে আনতে লাগলেন

তিনি। শরীরে তাঁর যথেষ্ট শক্তি, তবুও উঠ্‌বার সময়—চড়াই, বেশ কষ্ট হোতে লাগল। কিন্তু আনন্দও খুব হয়েছে—তিনি সিদ্ধিলাভ করেছেন।

এমন একটা ভয়ঙ্কর গুপ্ত কুঠরী কেন যে বাজপেয়ীবংশ তৈরী করেছিল, ভাবতে ভাবতে পথ চলছেন তিনি অমরনাথকে পিঠে করে—হঠাৎ টর্চ্চের আলোতে নজর পড়ল—একটা লেখা।

দেওয়ালের গায়ে একটি পিতলের ফলকে লেখা আছে ঃ—

"আমার বংশের সপ্তম পুরুষ এই ঘরে যেদিন আসবে সেইদিন আমি মুক্তিলাভ করবো। তারপর সে যেন সাতটি কঙ্কালের মাথার কাছে রাখা মোহরগুলি নিয়ে আমার শ্রাদ্ধ করে। কঙ্কাল গুলিকে যেন গঙ্গায় দেওয়া হয়—আর এই বাড়ীর এই দিকটায় যেন সাধারণ কাউকে ঢুকতে না দেওয়া হয়। ইতি—"

সিদ্ধেশ্বর বাজপেয়ী।

মিঃ শিকদার আশ্চর্য্য হয়ে ভাবতে লাগলেন—অমরনাথ এই বংশের সত্যিই সপ্তম পুরুষ এবং যেরূপেই হোক্ সে এই সাংঘাতিক ঘরে এসেছেও। কিন্তু কি করে ঐ সিদ্ধেশ্বর এত আগে জেনে গিয়েছেন যে অমরনাথ এমনি একটা ব্যাপার করবে?

বাইরে এসেই প্রথম কাজ হোল তাঁর অমরনাথকে সজ্ঞান করা; সন্ধ্যা তখন উৎরে গেছে। বন-জঙ্গল ভেঙে বাড়ী পর্য্যন্ত নিয়ে যাওয়া মুস্কিল—ঘাটের পাথরে অমরনাথকে শুইয়ে মুখে-চোখে জলের ঝাপটা দিতে লাগলেন শিক্‌দার মশাই।

রাত্‌টা জ্যোস্নার। সেই পুরাতন ঘাটের সিঁড়িতে শায়িত অমরকে বড় সুন্দর দেখাচ্ছিল মিঃ শিকদারের চোখে। যে ছেলে এইটুকু বয়সে ঐ রকম একটা দুঃসাহসিক কাজ করতে পারে, বড় হলে যে সে অসম-সাহসিক কাজ অনায়াসে করতে পারবে, মিঃ শিকদারের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হতে লাগল। কিন্তু অমরনাথ বোধ হয় আঘাত পেয়েছে, জ্ঞান তো এখনো ফিরলো না। বন-জঙ্গল ভেঙে বাড়ী নিয়ে যাওয়া যেতে পারে কিন্তু এখানে তো আর ভাল ডাক্তার নেই। মিঃ শিকদার ঘড়ি দেখলেন, সাতটা বাজতে মিনিট পনর বাকি আছে। তাড়াতাড়ি ষ্টেশনে গেলে তিনি সাতটার ট্রেণ ধরে অমরকে কল্‌কাতায় নিয়ে যেতে পারেন। অমরের বাপ-মাকে খবর পরে দিলেই চল্‌বে। তাঁরা তো কাঁদ্‌ছেনই,—কাঁদুন আরো কিছুক্ষণ। চিন্তা মাত্রেই মিঃ শিকদার অমরকে পিঠে তুলে নিয়ে সটান পুকুরপাড় ধরে ষ্টেশনের দিকে চললেন।

রাস্তায় কারুর সঙ্গে দেখা হোল না যে অমরের বাবাকে খবরটা পাঠাতে পারেন। ষ্টেশনে পৌছাবার সঙ্গে সঙ্গে ট্রেণও এসে গেল—একখান সেকেণ্ড ক্লাস কামরায় অমরকে শুইয়ে দিয়ে তিনি গার্ডকে বলে বসতেই গাড়ী ছেড়ে দিল।

ভোরবেলা জ্ঞান ফিরলো অমরনাথের। সুন্দর সাদা নরম বিছানায় শুয়ে আছে অমরনাথ—চোখ মেলতেই একজোড়া ডাগর চোখের সঙ্গে পরিচয় ঘটল।—কে হীরু ?

মেয়েটি চট্‌করে উঠে বেরিয়ে গেল। বারান্দায় দাঁড়িয়ে ডাকলো—মা-বাবা, ও চোখ মেলেছে!

ভোরের আলস্য ছেড়ে তৎক্ষণাৎ মিঃ শিকদার আর মিসেস্ শিকদার এসে দাঁড়ালেন। নার্সটা বলল,— জ্ঞান ফিরেছে, আর ভয়ের কোন কারণ নেই।

এই অপরিচিত আবেষ্টনী অমরের স্বপ্নবৎ মনে হচ্ছিল। গত দিনের ঘটনাটা একটু একটু মনে পড়ছে। স্বপ্নই বোধ হয়। কিন্তু এই ঘর, এই বিছানা, এই লোকজন, এরা সবাই তার অপরিচিত। তবে কি অমরনাথ স্বপ্ন দেখছে নাকি?

মিঃ শিকদার ওর কপালে হাত দিয়ে বললেন—ভয় নেই; তুমি ভাল যায়গায় আছ। তোমার মা-বাবা এখনি এসে পড়বেন।

—আমি কোথায় আছি?—ধীরে ধীরে বলল অমরনাথ।

—আমার বাড়ীতে। তোমাকে আমি তোমাদের ভিটের গুপ্ত ঘর থেকে বার করে এনেছি—আর একটু সুস্থ হলে বলবো সব কথা।

তাহলে স্বপ্ন নয়! অমরের সব ব্যাপারটা মনে পড়তে লাগল। প্রথম যে মেয়েটিকে অমর হীরু বলে ডেকেছিল, সে মিসেস্ শিকদারের আঁচল ধরে দাঁড়িয়ে দেখছিল। এগার বার বছরের ফুট্‌ফুটে মেয়েটি, হীরুর থেকে বড় কিন্তু হীরুর থেকে সুন্দর আর চালাক!

আরো একটু কিছু খাবার দিয়ে নার্স বলল—একটু ঘুমুতে চেষ্টা কর। অমরনাথ চোখ বুজলো।

বিকালের ট্রেণে এলেন অমরের মা-বাবা-হীরু।

অমর উঠে বসেছে এবং এর মধ্যেই মীনুর সঙ্গে বেশ ভাব জমিয়ে নিয়েছে। মীনু চিরটা কাল—অর্থাৎ তার জীবনের এই এগার বছর কলকাতা ছেড়ে কোথাও যায় নি। কাজেই অমরদের ভিটের গল্প শুনতে তার খুবই ভাল লাগছিল। অমরের বাবা-মাকে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে মিঃ শিকদার বললেন—দেখুন বাজপেয়ী মশাই, আমি শিকদার অর্থাৎ কিনা শিকারী—আপনার ছেলেকে শিকার করেছি, অতএব ও এখন থেকে আমার। পড়াশুনো করতে চায় তো এইখানেই যা পারে করবে—তা ছাড়া আমি ওকে আমার ব্যবসা শিখিয়ে যেতে চাই।

বাজপেয়ী-দম্পতী তো ছেলের ভবিষ্যতের এত বড় সম্ভাবনা কল্পনাও করেন নি। খুসি চাপতে না পেরে তাঁরা স্বামী-স্ত্রী একসঙ্গে হাঁ করে তাকিয়ে থাকলেন। ছেলে যেকেমন দিগ্‌গজ্ হয়েছে তা তো আর তাঁদের অজানা নেই! তাকেই যদি বিখ্যাত ডিটেকটিভ, মস্ত ধনী অরবিন্দ নিজের সহকারী করে নেন, আর পুত্রাধিক যত্নে কাজ শেখান, তাহলে তার চেয়ে আনন্দের আর কি হতে পারে!

অবশ্য কাজটা বিপজ্জনক—তা, ঐ কাজ করেই তো শিকদার মশাই এত বড় হয়েছেন। সম্মানের কাজ—; অতএব সম্মতি দিলেন তাঁরা।

অমরনাথ থেকে গেল শিকদার বাড়ী। মিনুর মাষ্টারের কাছে পড়া, মীনুর সঙ্গে খেলা করা এবং মীনুর বাবার প্রকাণ্ড মোটরে চড়ে বেড়ানো ছাড়া আর কিছু কাজ নেই। শরীর তিন দিনে হুম্বোর মত ফুলে উঠল তার।

দিন সাত পরে একদিন মিঃ শিকদার অমরকে ডেকে বললেন—তোমার বাবা তো গাঁয়ে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করেনা, তোমার দু'চারটা ওষুধের নাম নিশ্চয়ই জানা আছে।

—আছে সার—তাছাড়া বাবা বাড়ী না থাকলে আমিই অনেক সময়...

—রুগী মারো, কেমন? বললেন মিঃ সিকদার। তা বেশ। নীচের বড় হলটার পাশে যে ছোট একটা ঘর আছে, ঐটাতে তোমার হোমিওপ্যাথির ডিস্‌পেনসারী খুলে দিলাম; দেখে ফিরে এস এখানে।

—আচ্ছা সার,—বলে অমরনাথ বেরিয়ে গেল এবং দু' মিনিটের মধ্যে দেখে এসে বল্‌ল—আমি ডি, আর, অমরনাথ বাজপেয়ী, এম্‌-বি, (হোমিও)। হোলাম কখন সার?

—আজ সকাল থেকে—বললেন মিঃ শিকদার। ডি, আর, মানে ডিটেকটিভরত্ন এবং এম-বি মানেটা তুমিই বল।

—'মাল বার করি'—কেমন হয় সার'—?

—আরো ভেবে বলো—ঠিক বল্‌তে পারলে আজই তোমাকে নিয়ে কাজে নামবো। অমরের ইচ্ছে হোল বলে— "মাইরি বলছি"—"তাহলে গোটাটা দাঁড়ায়, ডিটেকটিভরত্ন অমরনাথ

বাজপেয়ী, মাইরী বলছি” কিন্তু ঐ রকম একটা কথা প্রবীন আত্মীয়ের কাছে বলা চলে না। আরো কিছুটা ভেবে বললে, —এম্ বি মানে ‘মরেও বেঁচেছি’।

—তার থেকে “মরাকে বাঁচাই” বললে আরো ভালো হয়। আচ্ছা, আজই তাহলে চলো তোমার সেই গুপ্তঘর থেকেই কাজ আরম্ভ করা যাক।

বিকাল সাড়ে ছয়টার ট্রেণে রওনা হলেন মিঃ শিকদার অমরকে নিয়ে। সন্ধ্যার অন্ধকার তখন বেশ নেমেছে। ষ্টেশনে নেমে তিনি কারো সঙ্গে দেখা পর্য্যন্ত করতে দিলেন না অমরকে; একেবারে পুকুরঘাটে এনে ফেললেন। টর্চ্চ আছে, কিন্তু জ্বাললেন না কোথাও। এতক্ষণে বললেন, —তুমি যেদিক দিয়ে ঢুকেছিলে সেটা আমি এর মধ্যে এসে একদিন দেখে গেছি, কিন্তু এদিকটা আজ ভাল করে দু’জনকেই দেখতে হবে।

ঘাটের পাথরের দরজাটা খুলে ফেললেন মিঃ শিকদার। তারপর প্রথম অমর এবং তার পিছনে মিঃ শিকদার ঢুকে পড়লেন সেই সুড়ঙ্গের মধ্যে। সেদিনকার সেই কড়াটাতে দড়ি বাঁধা পাথরটা এখনো ঝুলছে, দরজাটা খোলাই রয়েছে। মিঃ শিকদার প্রথম সেই দিকেই চললেন। অমরনাথ আগে চলেছে টর্চ্চ নিয়ে। খানিকটা গিয়ে মিঃ শিকদার পিছন ফিরে পিতলের ফলকে আলো ফেলে অমরকে লেখাটা দেখিয়ে দিলেন—বল্লেন—তোমার পিতৃপুরুষের কাজ করতে হবে তোমায়—কিন্তু এখন নয়, আর একটু বড় হও; সস্ত্রীক্

শ্রাদ্ধ করবে। অমর মাথা নীচু করে সম্মতি জানালো। আবার ওঁরা চলতে লাগলেন। অমর যেখানটায় কাদার মধ্যে পড়ছিল, সেই জায়গাটা ভাল করে দেখতে হবে। সেদিন অমরকে নিয়েই তিনি ব্যস্ত ছিলেন, আজ এই রহস্য-ময় গুহার সব রহস্য তিনি ভেদ করবেন বলেই এসেছেন।

চারদিকেই দেওয়াল—গোল ইন্দারার মত গঠন ঘরটার। মিঃ শিকদার যেদিক দিয়ে ঢুকলেন, ঠিক তার বিপরীত দিকে দেওয়ালের গায়ে একটা লোহার কপাট রয়েছে, পাঁকে তার খানিকটা ডুবে গেছে। বহুকালের পাঁকমাটি আর বদ্ধ বাতাসের একটা বিশ্রী গন্ধ আস্ছে সত্যি, কিন্তু বাইরের বাতাসও আসছে কোথাদিয়ে। এতদিন এমনভাবে বদ্ধ থাকতেও ঘরটার হাওয়া খুব বেশী বিষাক্ত হয়নি। কিন্তু পাঁক কোন্ দিক থেকে এল? লোহার দরজাটা খুলবার চেষ্টা করলেন ওঁরা—বিস্তর টানাটানি করেও কিছু করা গেল না। দরজার তলায় যে পাঁচ-সাত ইঞ্চি পাঁক জমে ছিল, সেটা হাত-কোদালী দিয়ে সরিয়ে দিয়েছিলেন ওঁরা। দেখতে পেলেন, নীচের থেকে ঝরনার মত একটু একটু জল আসছে। মিঃ শিকদারের মনে হোল, দরজাটার সঙ্গে খিড়কীর পুকুরটার যোগ আছে। হয়ত দরজা খুললেই পুকুরের ঘাটে যাওয়া যাবে। শাবলটা দিয়ে তিনি যেই-না দরজার নীচেতে একটুখানি চাড় দিয়েছেন, অমনি ক্রীং করে একটি শব্দ আর তৎক্ষণাৎ দরজাটা উপর দিকে উঠে গেল। সঙ্গে সঙ্গে পুকুরের জল হু হু করে ঢুকতে লাগলো সেই ঘরটার মধ্যে। দরজাটা যেন জল আর ঘরের মাঝখানে লকৃগেটের মত ছিল।

এখুনি গর্ত্ত পূর্ণ হয়ে উঠবে। দেখতে দেখতে কোমর অবধি জল এসে গেল—মিঃ শিকদার কোন দিকে না চেয়ে অমরের হাত ধরে প্রায় ছুটেই ঘরটা থেকে বেরিয়ে পড়লেন—এলেন সেই ঢালু সিড়িতে, কিন্তু জলও তাড়া করে আসছে তাঁদের। বেশ বুঝলেন, এই ঢালু সিড়ি পর্য্যন্ত এখনি ডুবে যাবে। যতটা সম্ভব প্রায় ছুটে তাঁরা কোন রকমে দড়িতে ঝোলানো পাথরটার কাছ অবধি এসেই পাথরকে খুলে দিলেন কড়াটা থেকে। ঝনাৎ করে মাঝের কবাট বন্ধ হয়ে গেল।

ভিজে কাপড়চোপড় পরে বদ্‌লাবেন, এই সর্ব্বনেশে বাড়ীতে যে জন্য আসা তা এখনো হয় নি—সে ঐ কঙ্কালগুলোর মাথার কাছের ঘটিগুলো পরীক্ষা করা—আর, আরো যদি কিছু থাকে তো তাও দেখা।

খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে ওঁরা দেখলেন, জল কতদূর অবধি ওঠে। প্রায় আধ ঘণ্টা পরে কড়াটা টানলেন মিঃ শিকদার। দেখা গেল ঢালু সিড়িটা সব ডোবে নি—ইচ্ছা কর্‌লে ওঘরে হয়তো আবার যাওয়া যেতে পারবে। কিন্তু জল বার করে তবে, নইলে তো ডুবে প্রাণ হারাতে হবে। ওদিকে আর না গিয়ে মিঃ শিকদার অমরকে নিয়ে সেই কঙ্কালের ঘরটা দেখতে চললেন।

সুড়ঙ্গ-পথে টর্চ্চ হাতে চলেছেন দুজনে—মনে হোল, কোথায় কে যেন মন্ত্র পড়ছে বিড় বিড় করে। কান পাতলেন মিঃ শিকদার,—অমরও। কিছুই বোঝা যাচ্ছে না—কোন পোকামাকড় হবে হয়তো, ভেবে আবার চলতে লাগলেন ওঁরা। ঘরের দরজাটা খোলাই রয়েছে—মিঃ শিকদারই বোধ হয়

অন্তমনস্কভাবে সেদিন খুলে রেখে গিয়েছিলেন—কিন্তু কে ও! চমকে উঠলেন দুজনেই। কে যেন মেঝেতে বসে রয়েছে বীরাসনে। অমরের গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠলো। টর্চের বোতামটা বুড়ো আঙ্গুলে টিপে রেখেছিল সে, হঠাৎ ঝাঁকি লেগে ছেড়ে ফেলেছে। তৎক্ষণাৎ আত্মসম্বরণ করে আবার বোতাম টিপলো—বাতি কেটে গেছে—জ্বললো না। অভেদ্য অন্ধকারে ডুবে গেলেন মিঃ শিকদার আর অমরনাথ। কিন্তু ডিটেকটিভদের অত সহজে ঘায়েল হলে চলে না। পকেট থেকে দেশলাই বার করলেন মিঃ শিকদার; বললেন—ভয় করছে নাকি অমর?

—না স্যার, ভয় কি! কিন্তু কেউ ঢুকেছে বোধহয় এখানে।

—চল, দেখা যাক্—মিঃ শিকদার দেশালাই জ্বাললেন,—মোমবাতি আছে পকেটে, জ্বেলে ফেললেন তিনি। বেশ ধীরে অগ্রসর হলেন ওরা।

ঘরে ঢুকে মোমবাতির ক্ষীণ আলোতে যতটা সম্ভব দৃষ্টি চালাতে লাগলেন দুজনে। নাঃ, কোথাও কেউ নাই—তবে কি দুজনেরই দেখতে ভুল হোল! কিন্তু ভূতের কথা ভেবে সময় নষ্ট করার লোক মিঃ শিকদার নন, অমরকে বললেন,—তুমিই এ বংশের উত্তরাধিকারী, অতএব তুমিই ঘটিগুলো হাতড়ে দেখ—কী আছে ওতে।

অমরনাথ প্রথম থেকে আরম্ভ করল। ঘটির ভেতর বহু দিনের পুরানো পচা একটা আঠামতন পদার্থ, খুব সম্ভব কারণবারি, শুকিয়ে গেছে, আর তাতে রয়েছে একটি মাত্র মোহর। এই রকম প্রত্যেক ঘটতেই, সাতটাতে সাতটি মোহর পাওয়া

গেল—অবশ্য সোনার। খুব বেশি কিছু মূল্যবান সম্পদ নয়, তবু শ্রাদ্ধের খরচের জন্য এই যথেষ্ট। এরপর কঙ্কালগুলোকে গঙ্গার জলে কেমন করে দেওয়া যাবে তাই ভাবতে লাগলেন মিঃ শিকদার।

অমর বল্লে—এখন ওসব থাক্ স্যার—শ্রাদ্ধ তো এখন করছি না, ওসব সেই সময় করা যাবে।

—সেই ভালো—বল্লে মিঃ শিকদার এগুচ্ছেন বাইরের দিকে, অমরনাথ ডাকলো—দেখুন স্যার, মেঝেতে একটা কেমন মার্বেলের আসন রয়েছে, এইখানেই যেন ভূতটাকে বসে থাকতে দেখেছিলাম—নয় ?

মোমবাতির আলোতে মিঃ শিকদার দেখলেন, আটকোনা একখণ্ড মার্বেল ঠিক মেঝের মধ্যেখানে পোঁতা। হাতের শাবলটা দিয়ে ওর একটা কোনার সরু ফাঁকটায় চাড় দিলেন তিনি—খুব সাবধানে; যদি আবার জল বেরিয়ে পড়ে, এই ভয় আছে। পাথরটা খুব আলগা, নড়ছে। কিন্তু শত চেষ্টাতেও স্থানচ্যুত হোল না। ওদিকে মোমবাতি ফুরিয়ে আসছে। মিঃ শিকদার বললেন—চল আজ—অন্যদিন দেখা যাবে।

কিন্তু অমরনাথ ইতঃস্তত করতে লাগল। আজই দেখতে চায় সে। মিঃ শিকদার ওর মন বুঝে শাবলটা ওর হাতে দিয়ে বললেন—দেখ আর একবার। অমর পাথরটাতেই দাঁড়িয়েছিল—হাতে সেই সাতটি মোহর, আর মোমবাতিটুকু। মোহর আর বাতি মিঃ শিকদারের হাতে দিয়ে সে পাথরটার উপর সজোরে একটা লাফ দিলো—আর সঙ্গে সঙ্গে পাথরটা অমরকে

নিয়ে প্রায় একমানুষ গর্ত্তের মধ্যে ঢুকে গেল, ঠিক আটকোনা একটা গর্ত্ত।

মিঃ শিকদার মোমবাতিটাকে এগিয়ে এনে দেখলেন, অমরনাথের মাথার চুল অবধি ভিতরে ঢুকে গেছে, হাত ধরে টেনে তিনি তুললেন ওকে, তার পর দুজনে বেরিয়ে আসতে গিয়ে চক্ষু কপালে উঠ্‌লো। পাথরটা নীচে নামার সঙ্গে সঙ্গে বেরুবার দরজাটা নিঃশব্দে বন্ধ হয়ে গেছে—পথ চিররুদ্ধ।

ভয়ে ভাবনায় অস্থির হয়ে উঠলেন শিকদার মশাই। কপাল তাঁর ঘেমে উঠল। মনে পড়ল—কোথায় এসেছেন, কেন এসেছেন, কাউকে তিনি বলে আসেন নি। কেউ খোঁজ করতেও আসবে না। এই কঙ্কালে-ভরা ঘরে অমরনাথের সঙ্গে তাঁর চিরসমাধি হয়ে যাবে—হা ভগবান!

পাথরটাকে তুলতে পারলেই দরজাটা খোলে, কিন্তু তুলবার কোন উপায়ই দেখা যাচ্ছে না। এ যেন ঘরে ঢুকিয়ে মানুষ মারবার ফাঁদ—বেরুবার উপায় নাই।

মোমবাতিটা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। খাটের উপর কঙ্কালগুলো যেন বিদ্রূপ করে উঠল তাঁর এতদিনের ডিটেক্‌টিভি বুদ্ধিকে। কী তিনি করবেন এখন? বিপন্ন, বিষণ্ণ অমরনাথ ভাবছে, তারই দোষে এই কাণ্ডটা ঘটল।

মোমবাতি পুড়ে শেষ হয়ে গেল। রইল দেশালাইএর কয়েকটা কাঠি সম্বল। ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন দুজনেই। একটা ফ্লাস্কে চা আর একটা ফ্লাস্কে জল এবং পকেটে ছুটুকরো রুটি

ছিল। ক্লান্ত অমরনাথকে একটা দেশালাই জেলে ধরতে বলে সেগুলো বার করলেন তিনি। একটা খাট থেকে খানিকটা বিছানার কাপড় ছিঁড়ে নিয়ে অমরনাথ আরো একটু বেশি আলো জ্বালাবার চেষ্টা করতেই মিঃ শিকদার বললেন,—ঘরে ধোঁয়া হয়ে গেলে দম্ আটকে মারা যাব—ও থাক্।

অমর নিজের বোকামী বুঝে চুপ করে রইল। আঁধারের মধ্যেই কোন রকমে চা-রুটি কিছু খেয়ে মিঃ শিকদার বললেন, —আজকার রাত হয়ত এইখানেই কাটাতে হবে—এখন রাত্রি নটা চল্লিশ।

শুনে অমরের মন শিউরে উঠলো। এইখানে, এই কঙ্কালের ঘরে, এই মৃত্যুপুরীতে রাত কাটাতে কার না প্রাণ শিউরে উঠে! কিন্তু কালই বা উদ্ধার করে কে! অমর কথা বলল না কিছু। যা হয় হোক্; একাতো নেই, তুজন আছে—কাটুক যেমন করে হোক।

মেঝের উপরেই বসেছিলেন তুজনে। অসহ্য ভাবটা কাটাবার জন্য মিঃ শিকদার বললেন—তোমার পূর্ব্বপুরুষ সিদ্ধেশ্বর মশায়ের নাম নিশ্চয় শুনেছ তুমি?

—আজ্ঞে হাঁ; তিনিই এ বংশের আদি পুরুষ। বড় তান্ত্রিক সাধক ছিলেন এবং এই বাড়ী, জমিদারী ইত্যাদি সবই তিনি করেছিলেন। অনেকে তাঁকে ডাকাতের সর্দ্দারও বলে— তবে সেটা গোপনে।

—এইরকম ভয়ঙ্কর বাড়ী যিনি করেছিলেন, তাঁর উদ্দেশ্য যে সাধু ছিল না, তার প্রমাণও রয়েছে ওই কঙ্কালগুলো।

—কিন্তু শব-সাধনা ইত্যাদির জন্য ওসব নাকি তান্ত্রিকদের প্রয়োজন হয় সার !

—মানুষ মেরে কোন সাধনা হয়, এ আমি বিশ্বাস করিনা অমর !

হঠাৎ কোথায় যেন কে কানাকানি করছে, মনে হোল। ভয়ে অমরনাথের হৃদপিণ্ড অবধি কাঁপতে লাগল। তারই পূর্ব্বপুরুষ সাধক সিদ্ধেশ্বরের সাধনার ঘরে বসে তাঁরই নিন্দে করতে ওর বিশেষ বাধছিল, তারপর ঐ শব্দ ! হয়তো স্বয়ং সিদ্ধেশ্বরই আসছেন। ভয়ে বিবর্ণ হয়ে উঠলো অমর ! বললো—বড্ড অন্ধকার—আর একটা কাঠি জ্বালুন স্যার !

মিঃ শিকদার বুঝেছেন, অমর ভয় পেয়েছে—সাহস দিয়ে বললেন—অত ভয় করলে কি আমাদের কাজ চলে ! ও শব্দ কিছু নয়।

—কিন্তু ঘরে যখন ঢুকছিলাম সার, তখন কে যেন···

—না—না ; সে ঐ সাদা মার্ব্বেল পাথরের উপর টর্চ্চের আলো পড়ে রিফ্লেকশন হচ্ছিল। ওটা চোখের ভুল।

—কিন্তু মন্ত্রপাঠও শুনেছি যে সার ?

—ও কিছু নয় ; কোন দিকে ফাক আছে, বাতাসের শব্দতে ঘরে ওরকম আওয়াজ লাগছিল।

—আর তো শুনছি না সার—বাতাস তো পৃথিবীতে শুকিয়ে যায় নি !

মিঃ শিকদার কী আর উত্তর দেবেন—বল্লেন—মন ঠিক কর। আমরা এই ভয়ঙ্কর বাড়ীর সব রহস্যজাল ভেদ করবো।

চুপ করে রইল অমরনাথ।

অনেক—অনেকক্ষণ কোন কথা নাই। মিঃ শিকদার অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন। এখান থেকে বার হবার উপায় করতেই হবে তাঁকে। এমন ভাবে বন্দী হয়ে মরতে পারেন না তিনি—মারতেও পারেন না এই ছেলেটাকে! ডাকলেন, —অমর! অমরের সাড়া পাওয়া গেল না। কি হোল! একটা দেশলাইএর কাঠি জ্বাললেন মিঃ শিকদার। ও হরি, অমর ঘুমিয়ে পড়েছে। ভালই হয়েছে। পকেট থেকে এক টুক্‌রো রুমাল বার করলেন, আগুন ধরিয়ে দিলেন তাতে। ঘরটা বেশ আলো হয়ে উঠল, আর কঙ্কালগুলো যেন সাদা দাঁত বের করে হেসে উঠল। রাগে দুঃখে তিনি ঘরটার এদিক থেকে ওদিক ঘুরতে লাগলেন। তারপর লাথি মারলেন দরজাটার গায়ে। লোহার কবাটের গাঁ এতোটুকু কাঁপলো না। কঙ্কালের খাটগুলোকে ধরে টানাটানি করলেন এদিক ওদিক—না, কোন রকমেই কোন সন্ধান-সূত্র পাওয়া গেল না। ওদিকে রুমাল প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, দেশলাইএর কাঠিও আর বেশি নাই। কি মুর্খ তিনি! টর্চ্চের জন্য একটা এক্‌ষ্ট্রা বাল্ব রাখা উচিৎ ছিল না কি? মাথা খুঁড়ে মরতে ইচ্ছে হচ্ছিল তাঁর। ঘরে ধোঁয়াও জমছে, বেশী ধোঁয়া হলে দম্ আটকেই মরতে হবে। ঘরটা খুব বড়, এই যা রক্ষে—নইলে এতক্ষণ সাবাড় হয়ে যেতে হোত। খুব ভাল করে ভেবে দেখলেন শিকদার মশাই, প্রথম যেদিন তিনি এ ঘরে এসেছিলেন সেদিন ঐ দরজা তিনি খোলেন নি। ওটা খোলাই ছিল। অতএব

বোঝা যাচ্ছে, ওটা ভিতর থেকেই বন্ধ হয় এবং ভিতর থেকেই খোলে। কিন্তু কি কৌশলে খুলবে! সর্ব্বাঙ্গ ঘামে ভিজে উঠল শিকদার মশায়ের। নিরুপায় হয়ে তিনি আবার বসে পড়লেন। আলো নিবে গেছে অনেকক্ষণ।

আশ্চর্য্য! এই অবস্থাতেও অমরনাথ ঘুমিয়ে পড়ল কি করে? ডাকলেন আবার—অমর? সাড়া নেই—আবার ডাকলেন গায়ে হাত দিয়ে—না, সাড়া নেই। এ যেন কালনিদ্রা। কি হোল ওর?

হঠাৎ মনে পড়ে গেল—ঐ ঘটির ভিতর কি একটা আঠার মত পদার্থ অমর আঙুল দিয়ে নেড়েছে আর সেই হাত না ধুয়ে চা-রুটি খেয়েছে। সর্ব্বনাশ! বিষ : নিশ্চয়ই। হায় হায় করে উঠল শিকদার মশায়ের স্নেহপ্রবণ প্রাণ।

হতাশ হবার সময় নেই। গায়ের কোটটা খুলে তাতেই আগুন জ্বালিয়ে দিলেন মিঃ শিকদার। অমরনাথ ঘুমুচ্ছে, না, অজ্ঞান হয়ে গেছে, বোঝা যাচ্ছে না। হয়তো খুব তীব্র নেশা ধরেছে ওর। ঈশ্বরকে ডাকলেন আজ বৈজ্ঞানিক মিঃ শিকদার।

যজ্ঞি-জ্বলার মত আলোটা খুব জ্বলে উঠেছে। দরজার ঠিক বিপরীত দিকে এক ফালি যায়গা ঝকমক্ করে উঠল। চট্‌করে উঠে গিয়ে মিঃ শিকদার দেখলেন, হাত দেড়েক চওড়া আর হাত চার উঁচু এক টুকুরা ব্রোঞ্জের পাত দেওয়ালের সঙ্গে মিশে আছে। দেওয়ালের কালো রংয়ের সঙ্গে চট্‌করে তফাৎ ধরা পড়ে না।

লেখা আছে :—পঞ্চভূতে ষট্‌কর্ম্মে দশবিদ্যা পূজি'
ত্রিবেণী সঙ্গমে অর্দ্ধোদয়ে মুক্তি খুঁজি!

মানেটা বোঝা যায় না। নানা রকমে ঐ লাইন দুটোর অর্থ বার করবার চেষ্টা করতে লাগলেন মিঃ শিকদার। শেষকালে ভাবলেন—এটা হয়তো ঐ সাধকের প্রার্থনা মন্ত্র—সাধক, অর্থ্যাৎ সিদ্ধেশ্বর—যে এই রকম একটা ভয়ঙ্কর মানুষখেগো ঘর বানিয়ে বহুদিন পূর্ব্বে স্বর্গ না নরক কোথায় গমন করেছে। রাগে মাথামুড় খুঁড়বার ইচ্ছা হচ্ছিল মিঃ শিকদারের। নিজেকে খানিকটা শান্ত করবার জন্য তিনি ঐ ফলকটার পাশেই বসে পড়লেন। কবিতার লাইন দুটো ছাড়া মাথায় আর কিছু নেই তাঁর, আর কোন চিন্তাই তাঁর মনে আসছে না। যাই হোক, শেষটা একটা মানে তিনি বার করলেন,—পঞ্চভূতের ৫ ষট্‌কর্ম্মের ৬ আর দশবিদ্যার ১০ যোগে ২১ হয়; তাতে ত্রিবেণী অর্থ্যাৎ ৩ সঙ্গম কিনা যোগ দিয়ে দাঁড়ায় ২৪, এইবার অর্দ্ধোদয়ে যেতে হবে। অর্থাৎ ২৪ এর অর্দ্ধেক ধরতে হবে—ফল হয় বারো—বেশ, কিন্তু বারো কি করলে মুক্তি পাওয়া যায়? খুঁজতে হবে। ঢুকবার দরজা, আর এই ফলক এবং বেরুবার দরজা এই ত্রিবেণীর কোন যায়গা—ভাবতে লাগলেন মিঃ শিকদার। শেষটায় তিনি সেই ফলকটাতেই বারোবার শাবলের বাড়ি মারলেন। কড়াং করে খুলে গেল ফলকটা, আর বেরিয়ে পড়ল সরু একটা সুড়ঙ্গ পথ।

আনন্দে অধীর হয়ে উঠলেন মিঃ শিকদার। মুক্তির পথ পেয়েছেন তিনি। কোটের নীচের হাতকাটা কামিজটা খুলে জ্বেলে দিলেন, আলোতে ঘর ভর্ত্তি হয়ে গেল। এইবার অমরনাথকে বুকে তুলে নিয়ে ঢুকলেন তিনি সুড়ঙ্গে। অত্যন্ত সরু

সুড়ঙ্গ। অতি কষ্টে অমরকে বয়ে নিয়ে তিনি প্রায় হাত পঞ্চাশ এসে একটা সিঁড়িতে হোঁচট খেলেন। সাবধানে সিঁড়ি বেয়েই উঠতে লাগলেন অন্ধকারে। কয়েকটা ধাপ উঠেই একটি ছোট কুঠরীতে পৌঁছলেন—বুঝতে বাকি রইল না যে এটা সেই সিন্দুক, যা উপর থেকে বন্ধ হয়ে আছে, ভিতর থেকেও খুলবার কোন উপায় নেই।

এতখানি আশা নিয়ে এসে এতটা নিরাশ হলে মানুষের কি অবস্থা হয়, কল্পনা করাও কষ্টকর। ঐখানেই অসাড় অমরকে শুইয়ে দিয়ে তিনি মৃত্যুর জন্য মনকে প্রস্তুত করতে লাগলেন।

প্রায় ঘণ্টাখানেক শরীর মন তাঁর ঝিমিয়ে রইল। কিন্তু এমন করে মৃত্যুকে বরণ করে নেবেন ডিটেকটিভ-সম্রাট মিঃ শিকদার! নাঃ, চাঙ্গা হয়ে উঠলেন তিনি আবার। শেষ চেষ্টা করবেন আর একবার। অমর প্রথম দিন যে উপরের সিঁড়ি থেকে ঝাঁপ দিয়ে নীচের গর্ত্তে পড়েছিল—সে গর্ত্ত আজই জলে ভর্ত্তি হওয়ায় তাঁরা ছুটে পালিয়ে এসেছেন—সেইটাই একমাত্র খোলা পথ, মনে হোল তাঁর। অমরকে পিঠে তুলে নিয়ে তিনি সেই সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে এলেন।

অমরকে পিঠে নিয়ে অত নীচুতে ঝাঁপ দেওয়া চলে না। তাছাড়া নীচের ঘরটায় কতখানি জল—ডুবে যাবেন কিনা, ভেবে দেখলেন। জল নিশ্চয় পুকুরের থেকে ঢুকছে। পুকুরের পাড়ের নীচে ঐ লোহার গেটের সঙ্গে খিলান করা সুড়ঙ্গ আছে নিশ্চয়ই। অতএব জলটা পুকুরের জলের সমান হবে। তাতে ঘরের সবটা নিশ্চয়ই ডুববে না।

যাই হোক—এ ছাড়া আর উপায় নাই। অমরের পরণের কাপড়টা খুলে লম্বালম্বি চার ফালি করলেন তিনি। দশ হাত কাপড় গাঁট দিয়ে প্রায় আটত্রিশ হাত লম্বা দড়ির মত হোল। বাকি দুহাত গাঁট দিতে গুটিয়ে গেছে। এইবার অজ্ঞান অমরকেঁ পিঠের সঙ্গে বাঁধলেন তাঁর পকেটের এক টুকরা দড়ি দিয়ে। অতঃপর শিলিংএর কড়ার সঙ্গে অমরের কাপড়ের একটা প্রান্ত বেঁধে টান দিতেই পায়ের তলার সিঁড়ি সরে গেল। ঝুলে পড়লেন মিঃ শিকদার দাঁতে দাঁত চেপে।

কাপড়ের দড়ির শেষ প্রান্তে এসে তাঁর পায়ে জল ঠেকলো। দড়ি আর নাই। বেশি যদি জল থাকে তাহলে নিশ্চিত ডুবে মরতে হবে। কিন্তু আর কোন রকম উপায় নাই। অমরকে পিঠে করে আবার উপরে উঠে যাওয়া মানব-সাধ্যের অতীত। বেশিক্ষণ ঝুলে থেকে লাভও নেই, পারবেনও না। ঈশ্বরকে স্মরণ করে মিঃ শিকদার সেই অন্ধকারের মধ্যে জলে ঝাঁপ দিলেন। মাটিতে পা ঠিকলো; তখন উপর দিকে হাত তুলে দেখবার চেষ্টা করলেন, জল তাঁর মাথা ছাড়িয়াও হাত খানেক উঠেছে। অজ্ঞান অমর পিঠে বাঁধা আছে। কি অবস্থায় আছে, বুঝতে পারছেন না—যতটা সম্ভব তার মাথাটা জলের উপর জাগিয়ে রেখে সাঁতার দিয়ে ঘুরতে লাগলেন মিঃ শিকদার সেই গোল কুয়োর মধ্যে।

যে-পথ দিয়ে তিনি এই ঘরে প্রথম ঢুকেছিলেন, সেটা ঠিক দরজার মত আকারের চারকোণা আর যেপথে জল ঢুকেছিল সেটা অর্দ্ধ গোলাকার। সেই গোলাকার দরজাটাপা দিয়ে

খুঁজে বার করলেন তিনি। জলে ডুবে আছে, কিন্তু ডুব সাঁতার কেটে ওর ভিতর দিয়ে চলে গেলে খুব সম্ভব পুকুরে গিয়ে পড়া যাবে, সেখানে হয়তো ডুবজল, কিন্তু রাস্তা যদি সোজা হয় তো ভেসে উঠতে পারবেন তিনি।

যেমন ভাবা, মিঃ শিকদার অজ্ঞান অমরকে পিঠে নিয়েই অমনি ডুব দিয়ে সেই ডুবন্ত সুড়ঙ্গের পথে হামাগুড়ি দিয়ে চলতে লাগলেন। নিশ্বাস প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, আর বেশিক্ষণ পারবেন না—মনে মনে আর একবার ঈশ্বর স্মরণ করে আরো কয়েক পা অগ্রসর হোলেন। হাঁ, সুড়ঙ্গ শেষ হয়েছে,—পায়ের তলায় পাঁক মাটি—অমর সমেত উপরে ভেসে উঠলেন মিঃ শিকদার—আঃ মুক্তি, মুক্তি, মুক্তি। উপরে অনন্ত আকাশে অগণ্য তারার ফুল যেন তাঁকে অভ্যর্থনা করলো।

ত্বরিতে সাঁতার কেটে কাছের সেই ঘাটটাতেই উঠলেন এসে। অমরের নাকে মুখে জল ঢুকেছে কি না পরীক্ষা করতে গিয়ে বুঝলেন, জল লাগায় তার বরং উপকারই হয়েছে। গোটাদুই ঝাঁকুনি দিতেই নিশ্বাস তার জোরে পড়তে লাগল। আধ ঘণ্টার মধ্যেই অমরনাথ কথা বলল।

মিঃ শিকদার যতদূর সম্ভব অল্প কথায় ওকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিয়ে বললেন—আমি এই ভোরের ট্রেণেই কলকাতা ফিরে যাচ্ছি, এমনি ভিজে কাপড়চোপড়েই। তুমি আজকার দিনটা বাড়িতে গিয়ে বিশ্রাম করো।

নিজের উলঙ্গ অবস্থার দিকে চেয়ে অমর লজ্জায় হাঁটু চেপে বসেছিল, বলল—কাপড় নাই, কি করে যাব স্যার?

মিঃ শিকদার চিন্তিত হলেন একটু—তারপর তাঁর প্যাণ্টের তলার আণ্ডার ওয়্যার খুলে অমরকে দিয়ে বললেন—ভোর হয়ে এসেছে; এই সময় গিয়ে মা'র কাছে কাপড় চেয়ে নাওগে। এ সব কথা কিছু বলো না এখন বাইরের কোন লোককে। আজ বিশ্রাম করে কালই কলকাতায় চলে যাবে। প্যাণ্টের পকেট থেকে মোহর সাতটি বার করে অমরের হাতে দিয়ে মিঃ শিকদার ষ্টেশনের পথ ধরলেন—অমর বাড়ীর মধ্যে ঢুকলো।

অমরের মা বাবা তো এত ভোরে ঐ রকম অবস্থায় ছেলেকে ফিরতে দেখে প্রথমটায় ঘাবড়ে গিয়েছিলেন, যাই হোক, শেষটায় ঘটনার সব বিবরণ শুনে তাঁরা ব্যাপারটা আর কাউকেই ভাঙলেন না। অমর ভোরের ট্রেণে বাড়ী এসেছে—এই কথাই পাড়া প্রতিবেশী জেনে রইল॥

সারাটা দিন খেলাধুলো করে. হীরণকে নিয়ে কলকাতার গল্প বলে সন্ধ্যা কাটিয়ে রাত্রে ঘুমিয়ে অমর পরদিনই যাবার জন্য প্রস্তুত হোল। মিঃ শিকদারের কথাটায় অমরের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একটা স্পষ্ট ইঙ্গিত মা-বাবা পেয়েছেন, অতএব ছেলেকে তাঁরই হাতে ওঁরা ছেড়ে দিতে চান।

পরের দিন সকালের ট্রেণ ধরে অমর কলকাতায় পৌছাল। মিনতি ওরফে মীনুরাণী ছুটে বাইরে এসে

বলল---এলে অমর দা? পকেট থেকে একরাশ শিউলী ফুল বার করে ওর মাথায় পুষ্পবৃষ্টি করতে করতে অমর বলল—কে জানে এলাম কি না।

ওদের দু'জনের বেশ ভাব হয়ে গেছে এর মধ্যে। মীনু সেদিন এসে বলল,—কাল জন্মাষ্টমীতে যদি তুমি বাড়ী যাও তো আমাকে নিয়ে যেতে হবে। আমি দেখবো, কেমন ভূতুড়ে বাড়ী তোমাদের।

অমরের দিক থেকে আপত্তির কিছু নাই, কিন্তু শিকদার-দম্পতীর অনুমোদন আবশ্যক। মিসেস শিকদার বিশেষ আপত্তি করলেন না কিন্তু মিঃ শিকদার মৃদু আপত্তি তুললেন। মীনু বায়না নিল, যাবেই।

সকালের ট্রেনেই রওয়ানা হোল অমর মীনুকে নিয়ে। বাড়ীতে খবর দেওয়া আছে, ষ্টেশনে লোক আসবে—অবশ্য রাস্তা একটুখানি মাত্র। পাড়া গাঁ আর তার ঝোঁপ-জঙ্গল মীনু কখনো দেখেনি। ষ্টেশনে নেমেই আনন্দের উচ্ছ্বাসে সে নেচে উঠল।

বাড়ী পৌঁছেই হীরণের সঙ্গে ওর ভাব জমতে আধ ঘণ্টাও লাগল না। হীরুর বয়স সাত-আট আর মীনুর এগার—কিন্তু তাতে কি এসে যায়! ওরা হাসিতে গল্পে উচ্ছল হয়ে উঠল অল্পক্ষণেই।

সারাটা দিন বেশ কাটল---সন্ধ্যাটাও মন্দ গেল না—কালই কলকাতা ফিরে যাবে—দুচারদিন থাকতে পারলে বেশ হোত কিন্তু। সন্ধ্যায় জন্মাষ্টমীর কীর্ত্তন শুনে অনেক রাত্রে খেয়ে

হীরণ আর মীনু অমরের শোবার ঘরটার পাশের ঘরে শুয়েই ঘুমিয়ে গেল।

এ ঘর গুলো একেবারে উত্তর-পশ্চিম দিকে। এই প্রকাণ্ড তিন মহলা বাড়ীর পূর্ব্বদিকটার কথাই বলা হয়েছে, উত্তর পশ্চিম দিকের ঘর কয়খানি এখনো বাসযোগ্য এবং অমররা সেই দিকটার নীচের ঘরগুলোতে থাকে। উপরের ঘরের ছাদ প্রায় সবই ভেঙে পড়েছে। দক্ষিণ পূর্ব্ব দিকটা পুকুরের ধারে, পূর্ব্বে অন্তঃপুরিকাদের বেড়াবার বা স্নানাদি করবার স্থান ছিল, এখনো সেখানে বাঁধান ঘাট তার সাক্ষ্য দিচ্ছে—তবে কেউ আর এখন সেদিক মাড়ায় না। দক্ষিণ পশ্চিম দিকে ছিল প্রকাণ্ড কাছারী, হাতীশালা, ঘোড়াশালা, রঙ্গমঞ্চ, দোলমঞ্চ ইত্যাদি। সেগুলোর কোনটা এখনো খাড়া আছে, কোনটা ভেঙে স্তূপাকার হয়ে গেছে। দক্ষিণ পূর্ব্ব আর দক্ষিণ পশ্চিমের ঘরগুলোর মাঝখানে যে প্রকাণ্ড আঙিনা, সেটার মধ্যে পাঁচ সাতটা বড় বড় পাকা মরাই ছিল, এখন তাতে বট, অশত্থ, নিম গাছ গজিয়ে জঙ্গল হয়ে গেছে। আগেকার দিনে টাকা দিয়ে খাজনা দেবার চলন বড় ছিল না, ধান, গম ইত্যাদি দিয়ে প্রজারা খাজনা শোধ করতো আর বাজপেয়ী-বংশ এই সব বড় বড় গোলায় সেই ধান-চাল ভর্ত্তি করে রাখতো।

কোন প্রজা খাজনা না দিলে তাকে ধরে এনে শাস্তি দেবার ব্যবস্থাও এইখানেই করা হোত। আগামী কাল মীনু এই সব দেখবে, ঠিক করে রেখেছে, কিন্তু দেখাবে যে সেই অমরই এ সমস্ত ভালো করে এখনো দেখেনি।

মীনু আর হীরু একটা বড় খাটে ঘুমুচ্ছে—হঠাৎ মীনুর মনে হোল, তার গায়ে কে যেন খুব ঠাণ্ডা হাত বুলুচ্ছে। একেই তো মনটা এই ভয়ঙ্কর বাড়ীতে ভূতের ভয়ে অভিভূত ছিল, তার উপর ঘুমন্ত অবস্থায় আচমকা ঠাণ্ডা হাত লাগলে যা হয়—মীনু 'বাপরে' বলে একলাফে খাট থেকে নেমে পড়ল।

ঘরের কোনায় লণ্ঠনটা নিবু নিবু করে জ্বেলে রাখা হয়েছিল; মীনু সভয়ে দেখলো, একটা প্রকাণ্ড গোখরা সাপ তাদের বিছানায়। হীরু ঐ খাটেই শুয়ে ঘুমুচ্ছে কিন্তু সাপটা সেদিক না তাকিয়ে মীনুকে যেন তাড়া করলো। ভয়ে মীনু কোন দিকে না চেয়ে শুধু সাপ—সাপ—বলে বাইরে বেরিয়ে গেল।

অমরের ঘুম হয় নাই ভাল। মীনুর চীৎকার শোনামাত্র সে ছুটে বেরিয়ে এল তার ঘর থেকে—এসে না দেখলো সাপ—না বা মীনু! কোথায় গেল মীনু তাহলে! দূর থেকে মীনু যেন আর একবার চীৎকার করে উঠলো—ও মাগো!

এ যে ঐ অন্দরের উঠোন থেকে আওয়াজ আসছে। অমর টর্চ্চ হাতে নিয়ে তৎক্ষণাৎ সেই দিকে অগ্রসর হোল—ডাকলো, মীনু, মীনু!—কোন সাড়া শব্দ পাওয়া গেল না। টর্চ্চের আলোটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সারা উঠোনটা দেখলো সে—না, কোথাও মীনু নাই। অথচ সে যে এখনি এই দিক থেকে "মাগো" বলে ডেকেছে এতে অমরের তিলমাত্র সন্দেহ নাই। কী হোল তবে! অমর অস্থির হয়ে ওকে খোঁজবার জন্য উঠোনে নেমে পড়ল। বার বার চীৎকার করে ডাকতে লাগল—নিশুতি রাতে তার সেই আকুল আহ্বান আকাশে প্রতিহত হয়ে ফিরে আসতে লাগল।

অমর মাটির দিকে আলো ফেলে মীনুর পায়ের চিহ্ন খুঁজতে লাগল। হাঁ, এই পথেই এসেছে মীনু—এই যে ভিজে উঠোনে ছোট ছোট পায়ের দাগ। খানিকটা গিয়েই অমর দেখতে পেলে "শান্তিকুপ" বলে যাকে ছেলেবেলা থেকে সে জেনে এসেছে সেইখানে গিয়ে মীনুর পায়ের দাগ শেষ হয়েছে। মীনু তাহলে কূয়োতে পড়ে গেছে! উপায়?

কূয়োর ধারে এসে ভিতরে আলো ফেলে দেখলো অমরনাথ, মীনু যে ওখানে পড়েছে তার চিহ্ন রয়েছে স্পষ্ট অথচ সে নাই। কী সর্ব্বনাশের কথা! গর্ত্তটা বড় জোর সাত আট হাত গভীর। নীচের জমির উপর এত দীর্ঘ কালের ধুলোমাটি জমে আছে, সেখানে মীনুর পড়ে যাওয়ার দাগ সুস্পষ্ট অথচ তার দেহ নাই। অমর আর বিলম্ব না করে টর্চ্চটা হাতে নিয়ে কূয়োর মধ্যে ঝাঁপ দিল, ঝাঁপ দেবার সঙ্গে সঙ্গেই নীচের জমিটার একপাশ—যেদিকটায় অমর পা রেখেছে, ধীরে ধীরে নিচু দিকে ঝুলে পড়ল, আর অমরনাথ গিয়ে পড়ল আরো গভীর আরো বৃহৎ একটা গহ্বরে। টর্চ্চটা হাতে আছে। যেখানে পড়ল, সে জায়গাটা কিন্তু খুব নরম, যেন নারকেল ছোবড়ার গদি পাতা আছে, গায়ে কিছুই ব্যথা না পেলেও টাল সামলে দেখলো, মীনু কাছেই মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে আছে। উপরের দিকে টর্চ্চ ফেলে দেখলো,—যেখানটায় সে রয়েছে সে যায়গাটা ইন্দারায় মত চওড়া কিন্তু গর্ত্তটা যত উপরে উঠেছে ততই সরু হয়ে গিয়ে পাতকোর মত হয়েছে, আর অনেক উঁচুতে একটা গোলাকার ঢাকনি দুপাশে দুটো কড়ায় দেওয়ালের সঙ্গে

আটকানো আছে। ওরই উপর অমরনাথ পা রেখে দাঁড়িয়েছিল, এবং ওটা কাত হয়ে যাওয়ায় সে এখানে এসে পড়েছে। খুব সম্ভব সাপের ভয়ে পালাতে গিয়ে এমনি করে মীনুও এইখানে এসে পড়েছে।

কী করে অমরনাথ মীনুকেই বা উদ্ধার করবে আর নিজেই বা উদ্ধার হবে? মীনুকে পরীক্ষা করে বুঝলো, অজ্ঞানতা ঘোচাতে এই ঘরের বদ্ধ হাওয়া কোন সাহায্য করবে না। কেউ জানে না রাত্রের এই বিপদের কথা। বাবা-মা হয়তো ঘুমুচ্ছেন নিশ্চিন্ত মনে! রাত এখনো অনেকখানা আছে, কী আর করবে সে! মীনুকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে কপালে হাত বুলোতে লাগল।

এই কূয়োতে ফেলে দুষ্ট প্রজাদের শায়েস্তা করা হ'ত—এ কথা সে ঠাকুরমার মুখে শুনেছে। কিন্তু এর ভেতর যে এমন কল আছে, ঠাকুরমাও সেটা জানতেন না। কিন্তু এই কূয়োতে প্রজাকে ফেলে দিয়ে নিশ্চয়ই বার করে নেওয়া হোত, কারণ একেবারে হত্যা করলে এখানে হাড়গোড় পড়ে থাকতো তো! আলোটা ভাল করে ঘুরিয়ে দেখতে লাগল। হাঁ, একটা দরজা রয়েছে বটে কিন্তু বন্ধ সেটা। অমরনাথ প্রাণপণ বলে ধাক্কা দিতে লাগল, লাথি মারতে লাগল ওর উপর! কাঠের দরজা, অল্প একটু ফাঁক হোল। ওদিকে বোধ হয় ধূলোমাটির জঞ্জাল জমে আছে। ঐ অল্প ফাঁকেই হাত ঢুকিয়ে অমরনাথ সেগুলো সরিয়ে দিতে লাগল আর দরজাটা একটু একটু করে খুলতে লাগল।

প্রায় ঘণ্টাখানেকের পরিশ্রমের পর দরজটা খুলল ; দু'পাশের দেওয়ালের মাঝখানে একটা সরু রাস্তা ক্রমাগত ঢালু হয়ে উপরের দিকে উঠে গেছে—সিঁড়ি নয় ; এ যেমন খেলা করবার জন্য টিনের তৈরী পুকুরের জলে বসান, এক রকম মাচা থাকে— যার উপরে চড়ে পিছলে এসে জলে পড়া যায়, ঠিক সেই রকম। সিড়ি একে বলা চলে না, কোথাও কোন খাঁজ নেই একটু যে পা দিয়ে দাঁড়ানো যাবে। এই সাংঘাতিক পথ বেয়ে মিনুকে নিয়ে সে কেমন করে উঠবে, আর উঠে যাবেই বা কোথায় তাও তো জানা নেই ; তথাপি ঐ একটীমাত্র পথ—অতএব ঐ দিকেই যেতে হবে। এদিকে এই বদ্ধ ঘরে থেকে মীনু হয়তো আরো বেশি অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছে। অমর আর মুহূর্ত্ত দেরী না করে মীনুকে পাঁজাকোলা করে সিড়ি বেয়ে উঠতে লাগলো। অত্যন্ত সাবধানে উঠছে সে, দু'পাশে দেওয়ালে মীনুর পা-মাথা ঠেকে ঘষ্‌ড়ে যাচ্ছে—তার মাথাটা আর একটু তুলে কাঁধের উপর রাখল অমর—তারপর ধীরে ধীরে উঠতে লাগল। তার বার বার মনে হচ্ছিল, তার সেই পূর্ব্ব-পুরুষ স্বর্গীয় সিদ্ধেশ্বের যেন তাঁর শ্রাদ্ধ না করার জন্যই অমরকে এ ভাবে শাস্তি দিচ্ছেন। বেরুতে যদি পারে অমর এখান থেকে, তাহলে আজই ওঁর শ্রাদ্ধ চুকিয়ে দেবে সে।

খানিকটা করে যায় আর দাঁড়ায় অমর। বুকের ওপর মূর্ছিত মীনুর দেহ মাঝে মাঝে কেঁপে উঠছে, তাতে অমরকে বেশ একটা ঝাঁকি সইতে হচ্ছে। একবার পা পিছলালে আবার সেই অতল গর্ভে পড়ে হাড়গোড় চূর্ণ হয়ে যাবে---অমর

পাশের দেওয়ালটায় ভর দিয়ে দিয়ে যাচ্ছে, চট্‌করে পা পিছলাবে না। খানিকটা গিয়ে দেখল, একটা মোটা রশি বরাবর চলে গেছে উপরের দিকে। সেইটা ধরে চললো অমর।

অনেকখানা উঠতেই যেন বাইরের হাওয়া গায়ে লাগল ওর। রাত্রি না হলে হয়তো আলো দেখা যেত। অমর দ্বিগুন উৎসাহে উঠতে লাগল। সিড়িটা কোথায় গিয়ে শেষ হয়েছে, কতখানি উঁচুতে, ভেবেই পাচ্ছে না সে। প্রায় ঘণ্টাখানেক থামা আর হাঁটার কসরৎ করে অমর মীনুকে নিয়ে যেখানে এসে দাঁড়াল, বুঝতে পারল, সেটা পশ্চিম দিকের কাছারী-বাড়ীর চিলেকোঠা যার ছাদ ভেঙ্গে পড়েছে বহুদিন; অমরের বাবাও কখনো ঐ চিলেকোঠায় আসেন নি। ঐ কাছারীর দোতালার সব ছাদটাই ভেঙ্গে গেছে, আছে শুধু চিলে কোঠাটি কিন্তু ছাদভাঙ্গার ইটে নীচের সিড়ি একদম বন্ধ হয়ে যাওয়ায় কেউ আর ও চিলে-কোঠায় উঠতে পারে না।

উঠানের মাঝ থেকে একবারে পশ্চিম-দক্ষিণ কোণের চিলেকোঠায় এসে অমর মীনুকে নামিয়ে নীচে চেয়ে দেখলো, মাটির পৃথিবী বহু নিম্নে—কি করে এবার নামা যায়?

কিন্তু মীনুর জ্ঞান সঞ্চার করা দরকার তার পূর্ব্বে। রাত প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। বাইরে যখন বেরুতে পেরেছে অমর তখন নীচে নামবার উপায় একটা হবেই, না হয় সকালেই সে উপায় হবে।

মীনুর মুখে চোখে একটু জল দিতে পারলে ভাল হোত কিন্তু ঐ আকাশের কাছাকাছি যায়গায় জল কোথায় পাবে

অমর! মীনুর মাথাটা কোলে নিয়ে সে মুখে চোখে ফু দিতে লাগল। এদিকে ভোর হয়ে আসছে—পূর্ব্বাকাশে সোনার লালিমা দেখতে পেলো অমর। মীনু আস্তে চোখ মেললো,
—মা—

—এই যে—ভয় কি? চোখ খোল লক্ষ্মীটি—অমর অভয় দিল ওকে। মীনুর জ্ঞানটা ধীরে ধীরে ফিরে এল—বল্লে—হীরু কৈ অমরদা? অমরের এত দুঃখেও হাসি পেল—বল্লে,—হীরু আছে, তুমি বসতে পারবে? মীনুর মনে পড়ে গেল—সাপে তাড়া করেছিল তাকে, তারপর সে কূয়োতে পড়ে গিয়েছিল—তারপর আর কিছু মনে নাই। বল্লে—আমাকে কূয়ো থেকে তুলেছো অমরদা?

—হাঁ, কূয়োর পাতাল থেকে একেবারে আকাশে তুলেছি। এইবার আবার মাটিতে ফিরতে হবে।

কথাটা বিশেষ বুঝলো না মীনু। আস্তে আস্তে উঠে বসল। দুজনে বাইরের দিকে তাকালো—ভোর হয়ে এসেছে—নীচের রাস্তায় হালগরু নিয়ে চাষারা চলেছে মাঠে যাচ্ছে, বেশ পরিস্কার দেখা যাচ্ছে। এইবার নামবার ব্যবস্থা করা দরকার। অমর জানে, চিলেকোঠার থেকে নীচে যাবার সাধারণ সিড়ি ইটকাঠ পড়ে বন্ধ হয়ে গেছে বহুদিন—তাতে অশথ-বট গজিয়ে গেছে। কাজেই সেদিকে গিয়ে লাভ নেই। দোতালার ছাদটা ভেঙে পড়লেও দেওয়ালগুলো এখনো খাড়া আছে—যদি ঐ দেওয়ালের উপর দিয়ে গিয়ে ওদিকের ছাদটায় পৌঁছানো যায় তাহলে ছাদে ছাদে উত্তর-পশ্চিম দিককার চিলেকোঠায়

পৌঁছাবে ওরা—আর ঐ দিকেই অমররা বর্ত্তমানে বাস করে এবং ঐ সিড়িটাই ব্যবহার করে। মীনুর হাত ধরে অমর বেরিয়ে আসছে, হঠাৎ তার নজরে পড়ল, যেখানে হেলানো সিড়িটা এসে মিলেছে—তার সামনেই ছোট একটি বেদী, এতেই সে মীনুকে শুইয়ে রেখেছিল। রাত্রে দেখেনি, ভোরের আলোয় দেখলো ঐ বেদীর উপর হাত দুই লম্বা-চওড়া একটি কাঠের পিঁড়ি ঠিক সিংহাসনের মত আর তার উপর একজোড়া খড়ম কতকাল থেকে যেন কার অপেক্ষা করছে।

অমরনাথের মনে হোল, এই বোধ হয় তাদের সেই পূর্ব্ব পুরুষ সিদ্ধেশ্বরের পাদুকা। মীনুর হাত ছেড়ে দিয়ে ভক্তিভরে প্রণাম করলো অমর সেই পাদুকাযুগলকে। সঙ্গে সঙ্গে মীনুও প্রণাম করলো। বার বার প্রার্থনা করলো অমরনাথ—অবিলম্বে সে ঐ পূর্ব্ব পুরুষের শ্রাদ্ধাদি করবার যেন সুযোগ পায়।

এরপর ওরা এসে দাঁড়াল বাইরে ভাঙ্গা দেওয়ালের মাথা বেয়ে ওদিকের ছাদে যাবার জন্য। কিন্তু এত উঁচু দেখে মীনুর বুক দুরু দুরু করতে লাগল। নীচের দিকে তাকাতেই ওর মাথা ঘুরে যাচ্ছে।

অমর বুদ্ধি করে মীনুর চোখদুটো তারই আঁচল দিয়ে বেশ করে বেঁধে দিয়ে বলল—রাস্তা আছে—তুমি আমার কোমরে হাত রেখে ঠিক পিছনে চলে এসো—অমর এগুলো।

পাশাপাশি দুজনের যাওয়া চলে না, তবুও দেওয়াল বেশ চওড়া, অমর অবলীলাক্রমে এদিকে ছাদের মাথায় উঠে মিনুকে হাত ধরে তুলে নিল এবং তারপর উত্তর পশ্চিম কোনের সিড়ি

দিয়ে যখন বাড়ীর উঠানে নামলো, তখনো মা-বাবা কেউ ওঠেনি। শুধু হীরু জেগে মীনুকে আর দাদাকে না দেখে ভাবছে, ওরা তাকে ফাঁকি দিয়ে বেড়াতে চলে গেছে। ও ঠোঁট ফুলিয়ে কাঁদবার উপক্রম করছিল।

হীরুকে ওরা রাত্রের ঘটনা কিছুই বলল না—শুধু বললে, ছাদে এক জায়গায় ওরা আজ ঠাকুর পূজা করবে। হীরুকেও নিয়ে যাবে সঙ্গে। শুনে হীরুর কান্না থেমে গেল।

অমর আর মীনু সকালেই স্নান করলো। ওদের কলকাতার অভ্যাস এই অছিলায়—অর্থাৎ মা-বাবাকে কিছু না জানিয়ে অমর খড়ম জোড়াটার পূজো করে আসতে চায়! হীরু অবশ্য সকালের জলযোগ বেশ ভাল করেই করলো।

করবী, জবা, আর দোপাটি ফুলে সাজি ভরে নিয়ে একটা প্রদীপে একটু তেল আর একটা দেশলাই নিয়ে অমর, মীনু সিঁড়ি দিয়ে উঠছে, হীরু একছুটে এসে বলল।—বারে! আমি যাব না? হীরু বড্ড ছোট— ওকে নিয়ে যাবার ইচ্ছে অমরের নাই তাই সে বলল—তুই প্রসাদ নিবি—আমরা পূজোটা সেরে আসি। কিন্তু পূজো না দেখে প্রসাদ নেবে, এমন মেয়ে নয় হীরু। সে তিন লাফে ওদের আগেই ছাদে উঠে পড়ল।

অমর আর কি করে। ওকেও নিতে হোল সঙ্গে। দেওয়ালের মাথায় মাথায় এবার ওরা নির্ভয়েই হেঁটে এল। মীনুটার ও সাহস বাড়ছে সংসর্গের গুণে। হীরু কিন্তু দিব্যি চলে এল। চিলে কোঠায় উঠে ওরা প্রদীপ জ্বেলে ফেলল; জায়গাটা জল দিয়ে একটু ধুলো, তারপর অমরনাথ পূজোয়

বসল। মীনু আর হীরু দেখতে লাগল পুজো। মন্তর বিশেষ জানা নাই, অমরনাথ অঞ্জলি ভর্ত্তি ফুল নিয়ে খড়মের উপর দিতে লাগল ভক্তি ভরে!

পুজো শেষ করে ওর মনে হোল, খুব যেন একটা বড় কাজ আজ সে জীবনে করেছে। পিঁড়িটা একটু বাঁকা হয়ে রয়েছে, একটু টেনে দিলেই সোজা হয়ে যায়—মীনুকে বলল অমর, —ধর তো রে মীনু সিংহাসনটা একটু সোজা করে দিই।

একদিকে মীনু হীরু—অন্য দিকে অমর যেই-না সিংহাসনটি তুলতে যাবে, বেদীর সমস্তটাই ওদের তিনজনকে নিয়ে অতল গর্ভে নামতে লাগল। কী সর্ব্বনাশ! মীনু হকচকিয়ে উঠলো, হীরু টাল সামলাতে না পেরে সিংহাসনের খড়ম জোড়ার উপরে মাথা ঠেকালে। বেদীটা বেশ ধীরে ধীরে নেমে চলেছে। দুপাশের দেওয়ালগুলো ক্রমশঃ অন্ধকারে মিলিয়ে যাচ্ছে। কতক্ষণ যে ওরা নামবে' কে জানে! এই আকস্মিক বিপদে অমর প্রায় বিহ্বল হয়ে পড়েছিল। হঠাৎ সে চীৎকার করে উঠলো—শালা সিদ্ধেশ্বর!

* *

কিন্তু গাল দিলেও বেদীর নামা থামলো না। প্রায় দু মিনিট ধরে ক্রমাগত ওরা নামছে। অমরনাথ এতক্ষণে বুঝতে পারলো, কলকাতার বড় বড় বাড়ীর লিফ্‌টের মত কোন কৌশল আছে এই বেদীটায়, আর ঐ চিলে কোঠায়—

LAXMISEN

যার জন্য বাড়ীর সব ছাদটা পড়ে গেলেও ঐ জায়গাটা পড়েনি। ওর দেওয়ালে নিশ্চয় লোহার খুঁটো আছে।

প্রায় দু-আড়াই মিনিট পরে বেদীটা এসে থামলো গভীর অন্ধকারের মধ্যে। হীরু এর মধ্যে কান্না জুড়ে দিয়েছে।

প্রদীপটা বেদী নামার সঙ্গে সঙ্গে নিবে গিয়েছে। হাতড়ে দেশলাইটা খুঁজে নিয়ে অমর আগে প্রদীপ জ্বেলে ফেলল। ক্ষীণ আলোতে বেশীদূর না দেখা গেলেও অমর দেখলো, বেদীটা যেখানে এসে থেমেছে, সেখানেই একটা বড় দরজা, তার কাঠের নক্সার কাজ এখনো সুন্দর রয়েছে। দরজাটায় ঠেলা দিতেই খুলে গেল—কিন্তু বহুদিনের বন্ধ হাওয়া বেরিয়ে প্রদীপটা দিল আবার নিবিয়ে। অমর নিজের নাক তো বন্ধ করলই, হীরুর নাকটাও টিপে বন্ধ করে রাখলো—আর মীনুকে নাক বন্ধ করতে বলল। একটা কি রকম গন্ধ,—অন্য কোন সুড়ঙ্গে এ রকম গন্ধ পায়নি অমর। এ আবার কোন যায়গা রে বাবা! অমর অনুমান করলো, তারা সোজা নেমে এসেছে দক্ষিণ পশ্চিম কোণের চিলেকোঠা থেকে; দরজাটা তাহলে উত্তর পূর্ব্ব কোণের দিকে হয়। খানিকটা হাওয়া বেরিয়ে যেতেই অমর আবার প্রদীপ জ্বেলে ফেললো,—তারপর সেই দরজার চৌকাঠের ভিতর আগে ঢুকলো নিজে, তারপর মীনু, সব শেষে হীরু। বেদীর খাঁচাটা কিন্তু আর ওপরে উঠলো না—নীচেই রয়ে গেল। দরজার পরেই বেশ সুন্দর পোড়ানো টালিপাতা রাস্তা, মসৃণ, চক্‌চক্ করছে এখনো!

অমর আগে আর মীনু-হীরু ভয়ে জড়সড় হয়ে জড়াজড়ি করে তার পিছনে চলতে লাগল—জলের ঘটিটা অমর বেদী থেকে তুলে নিয়েছে। দিনের বেলা বলে টর্চ সঙ্গে আনেনি; বড্ড ভুল হয়ে গেছে।

বেশ খানিকটা টালিপাতা রাস্তা পার হয়ে ঐ ক্ষীণ প্রদীপের আলোকে দূর থেকেই দেখতে পেল—একটা প্রকাণ্ড হল ঘরের ঠিক মাঝখানে একটি মানুষ বসে আছে।

গা ঝিম্ ঝিম্ করে উঠলো অমরের—ফিরতে যাচ্ছে কিন্তু ফিরেই বা যাবে কোথায়! দাঁড়িয়ে পড়ল অমর। পিছনে হীরু মীনু থর থর করে কাঁপছে।—ভয় কি?—অমর বলল। কিন্তু ভয়ে তার নিজেরই কাঁপুনি লেগেছে। হঠাৎ মনে পড়ল, সেদিনও এমনি একটা ব্যাপার ঘটেছিল, তারপর দেখা গেল সেটা কিছুই নয়—এও সেই রকমই হবে। মনে সাহস সঞ্চয় করতে লাগল অমর।

সামনে যাওয়া ছাড়া উপায় নাই। হীরু, মীনুকে ধরে অমর আস্তে এগুতে লাগল। মূর্ত্তি নড়ে না—অথচ বেশ প্রমাণ সাইজ মানুষের মূর্ত্তি। তবে কি ওটা পাথরের মূর্ত্তি? অমর সাহস করে এগিয়ে এল—হাঁ; পাথরেরই মূর্ত্তি। নিজের বোকামিতে হেসে উঠল অমর। তার হাসি সেই ভয়ঙ্কর বদ্ধ কক্ষে একটা উৎকট প্রতিধ্বনি তুললো—চমকে উঠলো হীরু-মীনু।

অমর তাদের সাহস দিয়ে ভিতরে ঢুকলো। প্রকাণ্ড হলঘর। চারপাশের চারটি দেওয়ালের মাঝখানে একটি করে লোহার আলমারী—দেওয়ালের গায়ে আঁটা—ঘরটার চারিদিকে পূর্ব্বকালের বেতের তৈরী কৌচ—কুর্সি, একদিকে সুন্দর কারুকার্য্য করা আব্‌লুষ কাঠের একটা বড় চৌকি—, তাতে ফরাস পাতা, তাকিয়া দেওয়া—ঘরের কড়ি থেকে মস্ত লম্বা একটা টানা পাখা ঝুলছে লোহার শিকলে! যিনি এ ঘরে বসতেন, তিনি যে কী রকম বড় মানুষ আর বিলাসী ছিলেন, তা ঘরটা দেখবামাত্র বোঝা যায়।

এখনো যেন ঐ কৌঁচ-কুর্সিগুলোতে আতর গোলাপের গন্ধ লেগে রয়েছে, মনে হয়। ঘরটা খুব সম্ভব মাটির নীচে। বোধ হয় গরমের দিন সেই পূর্ব্বপুরুষ এই পাতাল-ঘরে বসে থাকতেন। কিম্বা কুম্ভকর্ণের মত ঘুমুতেন। কুম্ভকর্ণই ছিলেন হয়ত তিনি।

হীরু খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল, সে কোন কথা না বলে চৌকির ফরাসে শুয়ে পড়ল—সঙ্গে সঙ্গে মীনুও।

অমর বললে—পিপাসা পেয়ে থাকে তো জল খা। কোন একটা উপায় করবোই—ভয় কি তোদের!

কিন্তু কি উপায় করবে তা সে নিজেই বুঝতে পারছে না। প্রথমে লোহার আলমারীগুলো খুলবার চেষ্টা করলো—উত্তর, দক্ষিণ আর পশ্চিম দিকের তিনটে আলমারী খুলতে কোন কষ্ট হোল না। অমর ভেবেছিল, ওর মধ্যে গুপ্ত ধন থাকতে পারে, কিন্তু খুলে দেখলো, সেকালের হাত-লেখা পুঁথিতে বোঝাই

আলমারী তিনটে। পূর্ব্বদিকের আলমারীটা কিন্তু কিছুতেই খোলা গেল না। নিরাশ হয়ে ফরাসের উপর এসে বসল অমরনাথ, জল খেলো খানিকটা। ওদিকে প্রদীপের তেল শেষ হয়ে গেছে—দেশলাইটা অমর ট্যাঁকে গুঁজে রাখল। ঘর অন্ধকার হয়ে গেল।

* * * *

সকালেই ছেলেরা ছাদে গেছে, এখনো কেন ফিরলো না—অমরের মা নীচ্ থেকে দু'একটা ডাক দিলেন প্রথম। ভাবলেন, মীনু নতুন এসেছে, অমর হয়তো তাকে ছাদ এবং চারদিকের দৃশ্য দেখাচ্ছে, হয়তো মীনুর ব্রাউনী ক্যামেরায় ছবি তুলছে ওরা। কিন্তু ক্রমশঃ বেলা বাড়তে লাগল—শেষটায় আর থাকতে না পেরে তিনি ছাদে এলেন ওদের ডাকতে। কোথাও কেউ নেই—গেল কোথায় তবে ওরা! নীচে নামলে তো তিনি দেখতেই পেতেন। দুচারটা জোরে ডাক দিলেন তিনি। সেদিনকার ব্যাপার দেখার পর থেকে বাড়ীটা সম্বন্ধে ওঁদের বেশ একটা আতঙ্ক জেগে উঠেছে মনে। সব সময় মনে হয়, এই ভয়ঙ্কর বাড়ী যেন তার সপ্তম পুরুষকে কোন এক সময় গ্রাস করে ফেলবে। সভয়ে তিনি স্বামীকে ডাক দিলেন। অমরের বাবা মীনুর জন্য টাটকা মাছ জোগাড়ের চেষ্টায় বেরুচ্ছিলেন, স্ত্রীর ডাক শুনে তাড়াতাড়ি ছাদে এসে ব্যাপার শুনে হতভম্ব হয়ে গেলেন।

—ঠিক ছাদেই ওরা এসেছে তো? না ঐ চণ্ডীতলা দিয়ে ছবি তুলতে গেছে?—জিজ্ঞাসা করলেন অমরের বাবা। অমরের

মা বললেন—না, বাড়ীর বার হয়নি ওরা, ছাদেই খেলা করবে বলে এসেছে।

—কিন্তু কৈ তাহলে—ওদিকে যদি গিয়ে থাকে—বলে ওঁরা সেই প্রকাণ্ড ছাদের যতটা এখনো মানুষ যাবার মত আছে, সব পাঁতিপাঁতি করে খুঁজলেন। কোন চিহ্ন পর্য্যন্ত দেখা গেল না।

ভাবনায় ওঁদের বুক শুকিয়ে আসছে। নিজের ছেলেমেয়ে তো গেলই, পরের মেয়ে মীনু—দুদিনের জন্য বেড়াতে এসেছে; কী সর্ব্বনাশ!

অমরের বাবা বললেন—কোন ফাঁকে নিশ্চয় বাইরে গেছে; আজ তো আর অমর একা যায় নি! আমি গ্রামটা ঘুরে দেখে আসি—বলে তিনি বেরিয়ে গেলেন আর অমরের মা ঘর আর বার করতে লাগলেন ভাবনায় অস্থির হয়ে।

ঘণ্টা দুই খুঁজে অমরের বাবা মুখ শুকনো করে ফিরে এসে বললেন—এই সর্ব্বনাশা বাড়ীই ওদের খেয়েছে—আমার ধুতি চাদরটা দাও—আমি শিকদার মশাইকে গিয়ে যে কি বলবো! কান্না পেতে লাগল ভদ্রলোকের। অমরের মা তো অনেক আগে থেকেই কাঁদছিলেন। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বাজপেয়ী মশাই কলকাতা চলে গেলেন—অমরের মা রান্নাবাড়া সব ফেলে রেখে ঠাকুর ঘরে গিয়ে শুয়ে রইলেন।

বেলা তখন একটা বেজে গেছে, শিকদার মশাই খাওয়ার পর বিশ্রাম করছিলেন, মীনুরা হয় তো সন্ধ্যা নাগাদ এসে যাবে—ওদের নিয়ে আজ একটু সিনেমায় যাবেন তিনি, একটা

ভাল ডিটেকটিভ বই আছে আজ মেট্রোয়। হঠাৎ বাজপেয়ী মশাই আসার খবর পেয়ে ভাবলেন, ওঁর সঙ্গে এই দুপুর রোদে হয়তো মীমু অমরও এসেছে। শোবার ঘরে ডেকে পাঠালেন ওঁদের। এলেন অমরের বাবা একাই, মুখ দেখেই মিঃ শিকদার বুঝলেন, বিপদের সংবাদ। তাঁর মন যেন প্রস্তুতই ছিল—বললেন—আবার হারিয়েছে অমর? বাজপেয়ী মশাই আর সামলাতে পারলেন না—ঝর ঝর করে চোখের জল ঝরে পড়ল; কোন রকমে বললেন—অমর, মীমু, হীরু. সব—সব কটাকেই গ্রাস করেছে আমার সর্ব্বনাশা বাড়ী। কি হবে শিকদার মশাই? ঐ রাক্ষুসে কুম্ভকর্ণের বাড়ী থেকে ওদের আর উদ্ধারের আশা নাই!—স্বরে তাঁর অসহ্য কাতরতা ফুটে উঠল।

নিজের মেয়ে মীমুও হারিয়েছে, এটা শুনবার জন্য যেন মিঃ শিকদার প্রস্তুত ছিলেন না—একটুক্ষণ তাঁর সাহসী হৃদয় বিহ্বল হয়ে রইল। তারপর অমরের বাবাকে সান্ত্বনা দিয়ে ঘটনার বিবরণ জানতে চাইলেন। কিন্তু বিশেষ কিছু অমরের বাবাও জানেন না। ট্রেণের জন্য অপেক্ষা না করে নিজেই মোটর চালিয়ে মিঃ শিকদার যখন এসে সেই রাক্ষসী ভিটের পৌঁছালেন, তখন বেলা আড়াইটা কি তিনটে।

অমরের মাও "ছেলেরা ছাদে গিয়েছিল" এর বেশি কিছু বলতে পারলেন না। মিঃ শিকদার বিলম্ব না করে তদারক সুরু করে দিলেন। প্রথমেই ছাদে উঠে তার চতুর্দ্দিক ভালো করে পর্য্যবেক্ষণ করলেন, যে দিকটায় ছাদ ভেঙে পড়েছে,

সেদিকেও এসে দেখলেন, ভাঙা ছাদ দিয়ে দোতালায় ওরা পড়ে গেছে কি না। কিন্তু কোথাও কিছু দেখা গেল না। ছাদে যদি ওরা উঠে থাকে তো নামবার সিঁড়ি ঐ একটাই অভঙ্গ আছে, যেটা এখন অমররা ব্যবহার করছে। কাজেই ওরা সিঁড়ি দিয়ে নামে নি, ছাদেও নেই, তাহলে হয় আকাশে উঠে গেছে (অসম্ভব) না হলে পাতালে নেমে গেছে। সেইটাই সম্ভব, ভেবে মিঃ শিকদার ভাঙা পাঁচিল বেয়ে দোতালায়, পূর্ব্বে যেটা কাছারী বাড়ী ছিল, সেইখানে এলেন। এরই ছাদটা ভেঙে পড়েছে আর ছাদে যাবার সিঁড়িটা রাবিশ পড়ে বন্ধ হয়ে গেছে। ঐ সিঁড়িরই চিলে কোঠায় সেই সাংঘাতিক খড়্গের পূজো করতে গিয়েছিল অমর।

মিঃ শিকদার দোতালার ভাঙা ঘরগুলো শ্যেনদৃষ্টিতে দেখতে লাগলেন। দেওয়ালগুলো এখনো দাঁড়িয়ে আছে, কত রকমের কুলুঙ্গী, আলমারীর ভাঙা কাঠ, দেওয়ালের গায়ে লাগানো র‍্যাক্ এখনো রয়েছে।—একতালার ছাদও স্থানে স্থানে ভেঙেছে—তাই মিঃ শিকদার খুব সাবধানে হাঁটছেন, কোথায় হয়তো ছাদ ভেঙে তাঁকে নিয়েই ধরাশায়া হয়ে যাবে।

একটা জায়গায় এসে তিনি দেখলেন, একটা কুলুঙ্গীর মত গর্ত্ত পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি কোণ করে নীচের দিকে নেবে গেছে। টর্চ্চের আলো যতদূর যায়, চালালেন, গর্ত্তটা যেন পাতালে গিয়ে পড়েছে—আলো তার সীমা পেলেনা। ওর ভেতর মানুষ গলতে পারে না, হাওয়া যাবার জন্যই বোধহয় ওটা করা হয়েছিল। একটুকরা ইঁট তুলে নিয়ে মিঃ শিকদার সেই

গড়ানে গর্ত্তটায় চালিয়ে দিলেন। গড়গড় করে ইঁটটা চলতে লাগল, শব্দটা কান পেতে শুনলেন তিনি। ইঁটটা যেন কোন একটা ধাতুপাত্রে গিয়ে লাগল, এমনি শব্দ পেলেন শেষটায়। নিশ্চয় ওখানে যাবার কোন রাস্তা আছে। সেটা বার করতে হবে।

অমরের বাবাও আজ মিঃ শিকদারের পিছনে এসেছেন। তিনি বললেন—এই গর্ত্তটা ছাদের সঙ্গে মিশে ছিল, নজর পড়তো না বলে তিনি কোনদিন দেখেন নি, ছাদ ভেঙে যাওয়ায় এখন বেশ দেখা যাচ্ছে। ছাদ অবশ্য ভেঙেছে তিনি যখন বালক ছিলেন, এমন কি তাঁর বাবার আমল থেকেই ভাঙতে সুরু করেছে। কিন্তু ভাঙবার পর আর এদিকে কেউ আসে না।

মিঃ শিকদার বুঝবার চেষ্টা করতে লাগলেন, গর্ত্তটা যে-ঘরের জন্য হাওয়া যোগায়, সে ঘরে প্রবেশের পথ কোথায় ? এদিক ওদিক ঘুরতে ঘুরতে তিনি দেখতে পেলেন, দোতলার বারান্দায় একটা মোটা থাম আর্দ্ধেক ভেঙে গেছে, আর তার মধ্যটায় রয়েছে ঠিক কূয়োর মত গর্ত্ত। বারান্দার থাম যে ফাঁপা হয়, এ ধারণা তাঁর কখনো ছিল না, কিন্তু এ বাড়ীর সবই আলাদা। থামটার গর্ত্তে একটা মানুষ অনায়াসে নেমে যেতে পারে—ওটা হয়ত ছাদ পর্য্যন্ত ফাঁপা ছিল, আর বেশি হাওয়া ঐ দিক দিয়েই ঢুকতো। মিঃ শিকদার ভাবতে ভাবতে আনমনে চলেছেন থামটা পার হয়ে—হঠাৎ পিছনে কড়াৎ করে একটা শব্দ শুনে ফিরে চেয়ে দেখলেন, যেখানকার যা সব ঠিক আছে.

শুধু অমরের বাবা, যিনি এই আধমিনিট পূর্ব্বে তাঁর ঠিক পিছনে আসছিলেন, তিনি নেই।

বিশালায়তন বারান্দায় অস্তসূর্য্যের আলো ঝলমল করছে। ছাদ নেই বলে আলোটা অত্যন্ত প্রখর। তখনো বেশ বেলা রয়েছে—এই দীপ্ত আলোর মাঝখান থেকে অমরের বাবাকে ভূতে ধরে নিয়ে গেল নাকি! জোরে ডাক দিলেন মিঃ শিকদার—কোন সাড়া এল না।

বারান্দাটা আর একবার সমস্তটা ঘুরে এলেন—সব যেমন তেমনি আছে। নীচে নামবার কোন রাস্তা নাই, যে রাস্তা ছিল তা বন্ধ হয়ে গেছে, যে ঘরগুলোর বারান্দা ছিল এটা, সে ঘরের কোনটার ছাদ নেই, পরিস্কার দেখা যাচ্ছে সমস্তই। অথচ অমরের বাবা নেই। মিঃ শিকদারের মনে হোল, নিজের বাড়ীতে শুয়েই স্বপ্ন দেখছেন হয়তো তিনি। কিন্তু স্বপ্ন হবার কোন সম্ভাবনা নেই! এটা দিনের বেলা।

যিনি এই বাড়ী তৈরী করিয়েছিলেন, তিনি কি রকম সৌখীন মানুষ ছিলেন তা এর ইঁট-কাঠ-পাথরে আজো লেখা রয়েছে,; বিশেষ করে ঐ কাছারী বাড়ীর প্রত্যেক দেওয়ালে, মূর্ত্তিতে, ফ্রেস্কোতে, কাঠের কারুকার্য্যে। এতো ভেঙেছে, তবুও এ যেন "মরা হাতী সওয়া লাখ—"এর মত। প্রত্যেক থামের গায়ে একটি করে নৃত্যশীলা পরীমূর্ত্তি, পাথরের কি পোড়ামাটির বোঝা যাচ্ছে না। যে থামটা ইতিপূর্ব্বে কাঁপা দেখে মিঃ শিকদার বিস্মিত হয়েছিলেন, সেটাতেও একটি পরীমূর্ত্তি। চারদিকের কার্ণিশে চীনেমাটির

লতাপাতা, ফুল, নানা রকম রঙিন পাথর বসান হয়ে এখনো যেন গৃহকর্তার সুরুচির পরিচয় দিচ্ছে। এটা যে একদিন রাজ দরবারের মত দেখতে ছিল, সেই কথা ভাবতে ভাবতে মিঃ শিকদার পশ্চিম আকাশের পানে চাইলেন।

ম্লান সূর্য্য ম্লানতর হচ্ছে, এখনি সন্ধ্যার আঁধার নেমে বাড়ীটাকে গ্রাস করবে! কিন্তু কি আশ্চর্য্য বাড়ী! অমর-হীরু মীনুকে তো জঠরে পুরেইছে, আবার অমরের বাবাকেও খেলো—বাকী আছেন মিঃ শিকদার—তাঁকেও এ সহজে রেহাই দেবে বলে মনে হোল না মিঃ শিকদারের।

কোথায় যেন একটা গুঞ্জন শোনা গেল। মিঃ শিকদার কান খাড়া করলেন—কিন্তু কে? কার যেন পদধ্বনি। আবার চমকিত হয়ে উঠলেন মিঃ শিকদার। না! কোথাও কিছু নাই। অথচ প্রতি মুহূর্ত্তে একটা কিছু অঘটন ঘটার আশঙ্কা করছেন তিনি। প্রতি পদে আশা করছেন কেউ যেন এখনি পিছন থেকে ডাক দেবে।

মনের এ রকম অবস্থায় কোন মতলব ঠিক করা সহজ নয়। কাছারীর দোতালা থেকে নেমে যাবার জন্য দেওয়াল বেয়ে তিনি এদিকের ছাদে এসে উঠলেন। সূর্য্য তখনো পূর্ণ অস্ত যান নি। একবার যেন মিঃ শিকদারের দিকে করুণ ব্যঙ্গের হাসি হেসে তিনি প্রস্থান করলেন। ধীরে ধীরে অন্ধকার পৃথিবীকে ঘিরে ফেলল।

শুধু তো আর অমর হীরু বা তার বাবা নয়, মিঃ শিকদারের নিজের মেয়েও যে গেছে! কী করে নিশ্চিন্ত

থাকবেন তিনি। নীচে নেমে অন্দরের উঠানটায় এলেন। কাঁচামাটিতে ছোট বড় পায়ের চিহ্ন তখনো আঁকা রয়েছে। সেই চিহ্ন ধরে মিঃ শিকদার এসে পড়লেন কূয়োটার কাছে। চম্‌কে উঠলেন তিনি—ওই কূয়োতেই তাহলে ওরা পড়ে গেছে! —এই তো ভিজে মাটিতে পায়ের দাগ, কূয়োর চার পাশের জঙ্গল বিপর্য্যস্ত হয়ে রয়েছে। মিঃ শিকদার আলো ধরে ভিতরটা দেখতে চাইলেন, নিতান্ত অগভীর কূপ, নীচের জমি বেশ দেখা যাচ্ছে, এবং তলায় মানুষের পায়ের দাগও রয়েছে, অথচ অমর, হীরু বা মীনু, কেউ-ই নেই! এখানেও কিছু ব্যাপার আছে নাকি? উপর থেকে তিনি কিছুতেই বুঝতে পারছেন না যে কূয়োর তলাটা কাৎ হয়ে যেতে পারে। তথাপি সন্দেহ প্রবল হয়ে উঠল, এবং বিলম্ব না করে তিনি নেমে পড়লেন কূয়োর মধ্যে। সঙ্গে সঙ্গে কূয়োর তলাটা কাৎ হয়ে তাঁকে অতল অন্ধকারে ফেলে দিল।

একটু সামলে নিয়ে টর্চ্চ জ্বাললেন তিনি, তলাটা পরিষ্কার দেখা গেল—পশ্চিম দিকে কাঠের দরজাটা আর তার পরেই সেই পাহাড়ের মত সিড়ি - যার কোন থাপ নেই, মসৃণ, পিছল, চক্‌চক্‌ করছে। সিড়িটা কোথায় উঠে গেছে, আন্দাজ করবার চেষ্টা করে সময় নষ্ট না করে মিঃ শিকদার ওর ওপর পা রেখেই উঠতে চেষ্টা করতে লাগলেন, কিন্তু তাঁর পায়ের জুতো বার বার পিছলে যেতে লাগল—এতো পিছল সিড়িটা। অমরনাথ এই সিড়ি দিয়ে যে নিশ্চয়ই উঠেছে এটা আন্দাজ করতে কষ্ট হোল না তাঁর। আশার উৎসাহে তিনি জুতো

মোজা খুলে ফেললেন এবং দুপাশের দেওয়ালে হাতের জোর দিয়ে উঠতে লাগলেন। অমরনাথ উঠার সময় যে একটা মোটা রডের মত দড়ি ধরে উঠেছিল, সেটা বেমালুম অদৃশ্য হয়েছে এখন। যাই হোক—অনেক পরিশ্রমের পর মিঃ শিকদার যখন সিঁড়িটার শেষাশেষি এসেছেন,—দেখলেন, একটা নীচু চার চাকার গাড়ী ঐ সিঁড়ির উপর—উপরদিকে একগাছা মোটা দড়িতে বাঁধা হয়ে ঝুলছে। এতক্ষণে সিঁড়িটার ধাপ না থাকার কারণ বুঝতে পারলেন তিনি। ঐ দড়িটা আলগা দিলে গাড়ীখানা নীচের কুয়োতে নেমে যায়—কিন্তু কি হয় ওতে? আপনার মনে প্রশ্ন করলেন মিঃ শিকদার। গাড়ীটা ভয়ঙ্কর ভারী, তার উপর তাতে চৌকা একটা ভারী পাথর চাপানো রয়েছে। চাকাগুলো বহুদিন পরে আজই চালানো হয়েছে, সেটাও বুঝ্‌তে পারলেন তিনি পরীক্ষা করে। একদু'বার গাড়ীটা ঠেলে নীচে নামিয়ে দেবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু নামলো না। দড়িটা ধরে মিঃ শিকদার চিলেকোঠায় উঠে এসে ব্যাপার বুঝতে পারলেন ভাল করে। দড়ীটা গাড়ী থেকে বেরিয়ে একটা কাঠের বড় চাকার মত কপিকলের ভিতর দিয়ে সটান নীচে নেমে গেছে, ঠিক আজকালকার লিফ্‌টের মত কোন একটা বস্তু ঐ ভাবে উঠানামা করানো হোত। গাড়ীটা নীচে নামিয়ে দিলে, লিফ্‌টটা উঠে আসতো আবার লিফ্‌টা নীচে গেলে গাড়ীটা এই যেখানে এখন রয়েছে সেইখানে উপরে উঠে আসতো।

ওদিকে ছাদ থেকে অমরদের দল এইখানে এসেছে কি না,

ভাবতে গিয়ে তিনি একটা আধপোড়া দেশলাইয়ের কাঠি কুড়িয়ে পেলেন। আর সন্দেহের অবকাশ রইল না—হীরু, মীনু, অমর ঐ লিফ্‌ট দিয়ে নীচে নেমে গেছে, উঠবার রাস্তা না পেয়ে বন্দী হয়ে আছে।—বুঝলেন; কিছু মাত্র ইতস্ততঃ না করে তিনি সেই মোটা রসিটা ধরে নীচে নামতে সুরু করলেন। সর্ সর্ করে কোন তলে চলে গেলেন মিঃ শিকদার সেই রশিটায় ঝুলে। হাতগুলো জ্বালা করলেও, বুঝতে পারলেন, দড়িটায় বহুদিনের চর্ব্বি এখনো লেগে রয়েছে। কী অপূর্ব্ব কৌশলেই না বাড়ীটা তৈরী করিয়েছিলেন সেই তান্ত্রিক সিদ্ধেশ্বর! কিন্তু কেন—? কী তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, তা আজো অন্ধকারে রয়েছে।

নীচে এসে মিঃ শিকদার থামলেন যেন একটা বড় রকম বাক্সের উপর। টর্চ্চ জেলে চারদিক চেয়ে দেখলেন, চারকোণা একটা ইন্দারা—তার মধ্যে নেমে এসেছে খাঁচার মত এই বাক্সটা। বাক্সের মাথার উপর রয়েছেন তিনি, বাক্সটার মধ্যে কেমন করে যাবেন ভাবতে লাগলেন—নইলে তো অমর মীনুদের সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে না। এইখান থেকেই তিনি একবার ডাকলেন—অমর, হীরু, মীনু! কোন সাড়া শব্দ পাওয়া গেল না। বাক্সটা নামার পর সুড়ঙ্গের দেওয়ালে চারদিকের ফাঁক খুব সামান্যই আছে।

ওরা যে এই পথেই এসেছে, এ সম্বন্ধে নিঃসংশয় হয়ে মিঃ শিকদার সেই লোহার মত শক্ত বাক্সটার উপরের ডালাটা ভেঙ্গে ফেলবার চেষ্টা করতে লাগলেন। কিন্তু সে ডালা ভাঙ্গা প্রায় অসম্ভব—কারণ ঐ রকম কাজ করার মত কোন

হাতিয়ার সঙ্গে আনেন নি মিঃ শিকদার। নিরুপায় হয়ে তিনি হতাশের মত বসে থাকলেন কিছুক্ষণ। তাঁর বার বার মনে হতে লাগল, আকাশের নীচে, মাটির কোলে বুঝি তিনিও আর ফিরে যেতে পারবেন না। এই রসি বেয়ে আবার সেই চিলেকোঠায় ওঠা প্রায় অসম্ভবের সামিল। এই রাক্ষুসে বাড়ী অমরকে, তার বোনকে এবং বাবাকে গ্রাস করেছে,—মিঃ শিকদারের মেয়েকেও খেয়েছে, এবার মিঃ শিকদারের পালা।

মনে পড়ে গেল—সেদিনের দেখা কঙ্কালগুলো। সঙ্গে সঙ্গে মনে হোল, সিদ্ধেশ্বর হয়তো এমনি করে মানুষ খুন করে তাদের কঙ্কাল ঐ ঘরে সাজিয়ে রাখতো। হয়তো ঐ কঙ্কাল-গুলি মানবজীবনে নির্ম্মল, নিষ্পাপ, শান্তিপ্রিয় মানুষ ছিল—ওদের হত্যা করে সাধনা করেছে ঐ শয়তান সিদ্ধেশ্বর!

কি যেন একটা আওয়াজ আসছে কোন দিক থেকে। কাছেই যেন কে কোথায় হাত পা আছড়াচ্ছে কিম্বা জোরে হেঁটে আসছে। হয়তো স্বয়ং সিদ্ধেশ্বর। আজন্ম সাহসী ডিটেকটিভ-চূড়ামণি শিকদারের হৃদ্‌পিণ্ড সত্যই কেঁপে উঠল। শব্দটা যেন ক্রমশঃ তীক্ষ্ণ হয়ে উঠছে, কে যেন ডাকছে কাকে, হ্যাঁ, তাঁরই নাম ধরে! কিন্তু যে ডাকছে সে যেন বহু দূরে—গলার স্বর এই বিশাল বাড়ীর রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রতিহত হয়ে স্বরের অধিকারীকে অচেনা করে দিচ্ছে। বার বার যেন শুনতে পেলেন মিঃ শিকদার তাঁর নাম, অথচ কথা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে না।

—৫

বসে থাকলে চলবে না। উঠলেন আবার মিঃ শিকদার। খাঁচাটার চারদিকের ফাঁক খুব ভাল করে তদারক করতে লাগলেন টর্চের আলো দিয়ে। পায়ের সাড়া বা গলার আওয়াজ কমে গেছে। মিঃ শিকদার বিচলিত না হয়ে দেখতে লাগলেন, কোথাও কোন ফাঁক দিয়ে তিনি ঐ খাঁচার নীচে নামতে পারেন কি না। পাশের সরু ফাঁক দিয়ে দেখতে পেলেন, পূর্ব্বদিকে একটা দরজা রয়েছে। কিন্তু খাঁচা আর দেওয়ালের মাঝখানে পাঁচ ছয় ইঞ্চির বেশি ব্যবধান নেই। ওটুকু ফাঁকে মানুষের দেহ গলে না। তথাপি ঐ হাস্যকর প্রয়াসই করতে লাগলেন মিঃ শিকদার তাঁর বিপুল দেহভার নিয়ে। হঠাৎ খাঁচাটা পিছন দিকের দেওয়ালে একটু সরে গেল এবং সেই ছয় ইঞ্চি ফাঁকটা আঠাশ-ত্রিশ ইঞ্চিতে পরিণত হল। সেইটুকু ফাঁকেই কাত হয়ে নীচে গলে এলেন মিঃ শিকদার।

খাঁচার মধ্যে কাঠের সেই সিংহাসনে খড়মের উপর আজকার পূজার ফুল পড়ে রয়েছে—দেখে আশায় আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠলেন তিনি। মনে মনে ভাবলেন, যদি কোন রকমে একবার ছেলেমেয়েগুলোকে ফিরে পান, তাহলে ইহজীবনে আর ভয়ঙ্কর এই বাড়ীর ছায়া মাড়াতে দিবেন না তিনি।

কাঠের দরজাটার কারুকার্য্য দেখে বিস্মিত হবার পূর্ব্বেই তিনি দূরে—অনেকটা দূরে মানুষের মৃদু কণ্ঠস্বর শুনে ডাকলেন, —অমর! সাড়া নেই—তাঁর কণ্ঠস্বর যেন নিজের কাণে ব্যঙ্গ করে উঠলো। মিঃ শিকদার দেরী না করে টালিবাঁধানো সেই রাস্তাটা ধরে চলতে লাগলেন। তাঁর নিশ্চিত ধারণা, অমররা

এই খাঁচার মত লিফ্‌টএ নেমে এই দিকেই গেছে। উৎসাহে আরো জোরে চলতে লাগলেন তিনি।

দূরে যেন কাদের পায়ের সাড়া পাওয়া যাচ্ছে—আরো, আরো জোরে হাঁটছেন মিঃ শিকদার। অকস্মাৎ দড়াম্ করে একটা বিকট আওয়াজ হোল—কোথায় কি যেন পড়ল—এত জোরে যে তার হাওয়ার ধাক্কা এসে লাগল মিঃ শিকদারের গায়ে। টর্চ্চের আলো যেখানে গিয়ে প্রতিহত হোল—মিঃ শিকদার দেখলেন, সেখানে একটা লোহার দরজা দেওয়ালের সঙ্গে জমাট হয়ে এঁটে বন্ধ হয়ে রয়েছে। ওদিকে সেই খাঁচা আর এদিকে এই বন্ধ দরজা, মাঝখানে মিঃ শিকদার বন্দী।

অমর-হীরু-মীনু গেছে, অমরের বাবাও গেছে, এইবার মিঃ শিকদারও গেলেন। কোন আশাই রইল না তাঁর আর উদ্ধারের। এই ভয়ঙ্কর বাড়ীর জঠরে একটু একটু করে হজম হয়ে যাবেন তাঁরা সকলেই।

এ যেন কোন্ অদৃশ্য হস্তের নিষ্ঠুর পরিচালনা। কে যেন কোথা থেকে তাঁদের আলাদা আলাদা যায়গায় বন্দী করে দিল। হয়তো এ কাজ সেই তান্ত্রিকাচার্য্য সিদ্ধেশ্বরেরই। তাঁর মুক্তির দিনে শ্রাদ্ধ না করায় তিনি কুপিত হয়েই হয়তো-বা এমনি করে তাঁদের মেরে ফেললেন। দুর্ব্বল হয়ে পড়ল মিঃ শিকদারের সবল, সুস্থ ডিটেকটিভ-মন। যা তিনি কোনদিন ভাবেন নি—সেই কাজই করলেন তিনি আজ। ভূতকে—সিদ্ধেশ্বরের প্রেতাত্মাকে বিশ্বাস করে বসলেন তিনি এতক্ষণে। বারবার ভাবতে লাগলেন—মুক্তি যদি পান, তাহলে সর্ব্বাগ্রে সিদ্ধেশ্বরের

শ্রাদ্ধ করাবেন—কঙ্কালগুলিকে গঙ্গার জলে দেবেন—তারপর অন্য কথা। লোহার দরজাটার ওপাশে কারা যেন কাঁদছে—হয়তো সেই কঙ্কালগুলোই—শিউরে উঠলেন ডিটেকটিভ মিঃ শিকদার।

অনেকক্ষণ বসে থেকে অমর একটা দেশালাই জ্বেলে দেখলো, হীরু সত্যিই ঘুমিয়ে পড়েছে। মীনু না ঘুমুলেও, এতো ক্লান্ত হয়ে রয়েছে যে কথা বলতেও ওর কষ্ট হচ্ছে। অমরেরও বেশ ক্লান্তি বোধ হচ্ছিল। মীনুর গায়ে মাথায় হাত দিয়ে সান্ত্বনার সুরে বল্লে—মা-বাবা-জ্যেঠামশাই আমাদের খুঁজে বার করবেন—ভয় কি? কিছুক্ষণের মধ্যেই এসে পড়বেন জ্যেঠামশাই।

তথাপি চাঙ্গা হোল না; কলকাতা থেকে তার বাবা এসে তবে তাদের উদ্ধার করবেন, ততক্ষণে মরে ওরা ভূত হয়ে যাবে, হায় হায়, কেন সে এসেছিল এখানে!

অমর বেটাছেলে—উপায় একটা তাকে করতেই হবে। ঘটির জলও ফুরিয়ে গেছে, পিপাসা পেয়েছে সবারই,—অস্থির হয়ে উঠল মন তার। উঠে গিয়ে পূর্ব্বদিকের আলমারীটায় আবার ধাক্কা দিতে লাগল। নাঃ, অটল আলমারী পাহাড়ের মত অনড় হয়ে রইল। বার বার এমনি করে ক্লান্ত হয়ে অমর মেঝের উপর সেই মূর্ত্তিটার কাছেই বসে পড়ল।

মূর্ত্তির মুখের মৃদু হাসি আলোটা জ্বলবার সময় তারা দেখেছিল—একটা দেশলাইয়ের কাঠি জ্বেলে অমর আর একবার দেখে নিতে চাইল মূর্ত্তিটা। ক্ষুদ্র একটা কাঠির আধো-অন্ধকারে মূর্ত্তিটা যেন বিদ্রূপ করছে—মনে হোল তার। এ নিশ্চয় সেই শয়তান সিদ্ধেশ্বরের মূর্ত্তি। রাগে প্রচণ্ড একটা লাথি মারল অমর মূর্ত্তিটার পিঠে। ঝড়াং করে একটা শব্দ—পরমুহূর্ত্তেই অমর দেখলো মূর্ত্তিটা মাটির তলায় নেমে গেছে! আর সঙ্গে সঙ্গে খুলে গেছে পূর্ব্বদিকের সেই আলমারিটা। কিন্তু পিছন দিকে চেয়ে অমরের মাথা ঘুরে গেল। যে দরজা দিয়ে ওরা এই ঘরে ঢুকেছিল, যা বরাবর খোলাই দেখেছে এবং হাওয়া আসবে ভেবে বন্ধ করবার চেষ্টা করেনি, সেই একমাত্র দরজাটির লোহার কবাট একেবারে বন্ধ হয়ে গেছে—ইহজন্মে খুলবার আর কোন আশা নেই।

আর একটা কাঠি জ্বেলে দেখলো অমরনাথ, মানুষপ্রমাণ সেই প্রকাণ্ড আলমারীটায় কোন তাক নেই—ভিতরটা একদম শূন্য। জ্বলন্ত কাঠিটা নিয়ে ওর মধ্যে এসে দাঁড়াল অমরনাথ। এদিকে দরজা বন্ধের শব্দে হীরু ভয় পেয়ে কেঁদে উঠেছে আর মীনুও তন্দ্রা ভেঙে কান্না জুড়েছে। এই ভয়ঙ্কর বিপদের সময় এই রকম বিব্রত হতে হলে মানুষের মন কি রকম হয়, বুঝতেই পারছো।

অমর ওদের কান্নার দিকে দৃকপাত মাত্র না করে আলমারীর ভিতরটা পরীক্ষা করতে লাগল।

মূর্ত্তির পিঠে লাথিটা যদি আর এক মিনিট পরে মারতো

[illegible], তাহলে হয়তো মিঃ শিকদার এসে পড়তেন। কিন্তু ভবিতব্য, নিয়তি !

একটি ষোল-সতের বছরের ছেলের সুমুখে একটি সাত-আট বছরের আর একটি এগার বছরের মেয়ে চোখের জলে ভাসছে ; কচি মুখ তাদের শুকিয়ে এতোটুকু হয়ে গেছে। অমরনাথ এ দৃশ্য আর দেখতে পারছে না। প্রাণপণ বলে সে সেই লোহার আলমারীটার ভেতরের দেওয়ালে লাথি মারতে লাগলো—আর গাল দিতে লাগল স্বর্গীয় সিদ্ধেশ্বরকে।

কিন্তু গাল দিলে তো আর মুক্তির উপায় হবে না ? রুদ্ধঘরে সারাদিনের অনাহারে অমরনাথ প্রায় কাহিল হয়ে পড়েছে—আর কতক্ষণই বা পারবে সে ! এই প্রকাণ্ড আলমারীতে কিছুই যখন রাখা হয় নি, তখন এইদিক দিয়েই দরজা আছে।—এই ধারণার বশবর্ত্তী হয়ে সে আলমারীতেই লাথি চালাচ্ছিল, অকস্মাৎ মীনু বলে উঠলো—এ ঘরের প্যাঁচ অন্য রকম অমরদা, —আলমারীর মধ্যে দরজার কথা বিস্তর ডিটেকটিভ উপন্যাসে পড়েছি আমি—এখানে অন্য রকম কিছু আছে নিশ্চয়। ও পরিশ্রম ছেড়ে দাও !

কথাটা অমরনাথের কানে লাগলো। মেঝের মাঝখানটায় ফিরে এসে সে সেই মূর্ত্তির পাতাল-প্রবেশের গর্ত্তটার মধ্যে দেখবার চেষ্টা করতে লাগল। মূর্ত্তিটা সাত-আট হাত নেমে গেছে। ওটাকে তুলতে পারলে নিশ্চয় ঢোকবার দরজাটা খোলে

কিন্তু কি করে তুলবে মূর্ত্তিকে ? অমরনাথ দেশলাইটা ট্যাকে গুঁজে নেমে পড়ল সেই গর্ত্তটার মধ্যে। মূর্ত্তির মাথার পা দিয়ে আর একটা কাঠি জ্বালল অমরনাথ—ঠিক মূর্ত্তির মাথায় সমান্তরাল হয়ে একটি সুড়ঙ্গ বেরিয়ে গেছে। আশার আনন্দে অমরনাথ ডাকলো,—মীনু-হীরু—আয়, পথ পেয়েছি।

মীনু-হীরুকে কোন রকমে নামাল সে, তারপর তিনজনে, আগে অমর, হীরু মাঝখানে আর মীনু শেষে চলতে লাগল। সুড়ঙ্গটা মাত্র পাঁচ সাত হাত গিয়েই উপর দিকে উঠেছে—সিঁড়ি আছে। মহা উৎসাহে অমর বলল—বার হবার ঠিক পথ পেয়েছি এবার।

পাঁচ-সাতটা সিঁড়ি ভাঙতেই ওরা এসে পড়ল আর একটা চওড়া সুড়ঙ্গে—এটা আর সিঁড়ি নয়—সমান্তরাল। উৎসাহে প্রদীপ্ত হয়ে উঠল মুখ ওদের। কয়েক হাত আসতেই কিন্তু অমর বুঝল, আনন্দের কোন কারণই ঘটে নি। সামনে একেবারে রাস্তা বন্ধ।

এই ক্ষুদ্র সুড়ঙ্গে আধ ঘণ্টাও থাকা চলে না তিনজনের; হাওয়া একদম নেই—একটা কাঠি জ্বেলে দেখলো অমরনাথ—সামনেটায় একটি দেওয়াল—আর তার গায়ের কুলুঙ্গীতে একটি মাটির কলসী বসান, তেল-সিন্দুর-চন্দন তার গায়ে এখনো যেন টাটকা হয়ে ডগমগ করছে। কলসীটা প্রকাণ্ড, জালা বললেই ভাল হয়—কী আছে ওর মধ্যে না দেখে অমরনাথ যাবে না। যদি সাপ থাকে, এই আশঙ্কায় সে প্রথমে একটা দেশলাই-কাঠি জ্বেলে ভিতরটা দেখলো, একটি ছোট কৌটা। বার করলো,

কৌটা খুলে [illegible] ছোট আংটি, পাথর বসানো—আলো লেগে সেটা ঝল্‌মল্ করে উঠল। খুসি হতে গিয়েও অমরনাথ খুসি হতে পারল না। মরতে চলেছে, আংটি নিয়ে কি করবে সে আর? কিন্তু কৌটার তলায় একটুকরো কাগজও রয়েছে—সেকালের ভূর্জপত্র বোধহয়। ঐ ক্ষীণ আলোতে সেই পুরানো-ধাঁজের লেখা পড়া অসাধ্য। কৌটা সমেত ট্যাঁকে গুঁজল সে। জালাটায় আর কিছু নেই—অতবড় একটা জালায় একটি কৌটামাত্র, অত্যন্ত বিস্ময়ের বিষয়—কিন্তু সে কথা ভেবে লাভ নেই এখন।

অমর ফিরে আসবার জন্য পা বাড়াল—সেই বড় ঘরটাতেই গিয়ে বসে থাকবে, এই মতলব। হঠাৎ জালাটা হুড়মুড় করে শানের উপর পড়ে গেল বোধ হয় অমরের হাত লেগে, চমকে উঠল সবাই ওরা। তৎক্ষণাৎ আলো জ্বেলে বিস্ময়-চকিত হয়ে দেখলো, —একটি জানালার মত পথ জালার ওপাশে লুকিয়ে ছিল। জালাটা অমরনাথের হাত লেগেই হোক বা অন্য কিছু লেগেই হোক, পড়েছে এবং দরজাটি বেরিয়েছে—কিন্তু এবার যেন অমর-নাথের মনে হোল, তার সেই পূর্ব্ব-পুরুষ সিদ্ধেশ্বরই ঐ পথটি তাকে দেখিয়ে দিলেন। এ যেন উত্তর-বংশধরকে এইখানে আনবার জন্যই তিনি এইভাবে বন্দী করেছেন। ভক্তিভরে বলে উঠল অমরনাথ—"জয় সিদ্ধেশ্বরের জয়। আমার পিতৃপুরুষ সিদ্ধেশ্বর—তোমায় প্রণাম করি—"প্রতিধ্বনিত হয়ে আওয়াজটা সুড়ঙ্গ-পথে অনেকক্ষণ গম্‌গম্ করতে লাগল।

ছোরু আর মীনুকে সাবধানে পার করে সে এপাশে এসে যা

দেখলো—তাতে উৎসাহ কিন্তু একদম নিবে গেল তার। দেখলো, ছোট জানালাটির পরেই কয়েকটা সিড়ি, এ সিঁড়ি তার চেনা,—সেই সিন্দুকে যাবার রাস্তা। আর সুড়ঙ্গটা বরাবর চলে গেছে সেই কঙ্কালের ঘরের দিকে। এইদিক দিয়ে ওকে সেদিন মিঃ শিকদার সেই উপরের সিঁড়িতে নিয়ে জলে ঝাঁপিয়েছিলেন। এখানে তো মুক্তির কোন উপায় নেই। সিন্দুক ভেতর থেকে খোলা যায় না। সিঁড়ি থেকে ঝাঁপ দিয়ে জলের মধ্যে মীনু-হীরুকে পার করে নিয়ে যাবার মত ক্ষমতা অমরের নেই—কঙ্কালের ঘরে যাওয়া যেতে পারে—কিন্তু সে দরজাও তো সেদিন নিজেই বন্ধ করে ফেলেছে ওরা। সে ঘরে যাবার আর ইচ্ছে নেই অমরের। কিন্তু করবে কি তাহলে এখন ?

কঙ্কালের ঘরের দিকেই পা বাড়াল অমরনাথ। মাঝখানের সেই ব্রোঞ্জের পাতটা খোলাই আছে—অতএব সেঘরে ঢুকবার কোন অসুবিধা হোল না। কঙ্কাল দেখে মীনু-হীরু ভয় পেতে পারে ভেবে অমরনাথ দেশলাই জ্বাললো না—হাত ধরে ওদের ঘরের মধ্যে নিয়ে এল। এ ঘরটা মস্ত বড়। ঘরের মাঝখানের সেই আসনটা মাটির নীচে নেমে গেছে সেদিন, সেখানেও যদি সুড়ঙ্গ থাকে এই আশায় অমর একবার আলো জ্বেলে দেখ্‌তে চায়—তাই মীনু-হীরুকে সে চোখ বুজতে বলল। একেই তো ভয়ে ওরা ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপছিল, তার উপর আবার এই অন্ধকারের মধ্যে চোখ বুজবে ? হীরু কেঁদে বলল—তুমি বুঝি পালাতে চাইছ দাদা ?

এত দুঃখেও হাসি পেল অমরনাথের ; পালাবে কোথায়

সে? ক্রুদ্ধ পিতৃ-পুরুষের আত্মা বন্দী করেছে তাকে—পালাবার কি উপায় রেখেছ?

দু'হাত জোড় করে করুণ কণ্ঠে বলল অমরনাথ যেন অন্ধকারকেই উদ্দেশ করে—মুক্তির উপায় করে দাও, হে মহাসাধক—তোমার আদেশ আমি কালই অক্ষরে অক্ষরে পালন করবো।

কোথায় যেন দুম্ দুম্ শব্দ হচ্ছে। কেউ যেন হাতুড়ী মেরে ভাঙছে বাড়ীটাকেই—কিম্বা কি হচ্ছে কে জানে—অমরেরও এবার সত্যি ভয় হতে লাগল। চারিদিকের সাজানো কঙ্কাল সে দেখে গেছে, আজ দাঁড়িয়ে আছে তারই মধ্যে। ভীষণ শব্দ—হয়তো সেই পূর্ব্ব-পুরুষ সিদ্ধেশ্বরই আসছেন। অন্ধকারে আর থাকা যায় না—দেশলাই জ্বাললো একটা অমরনাথ।

বিস্ময়ের মহা সমুদ্র জেগে উঠল তার চোখের সামনে। আসনটা ঠিক মেঝের সামিল হয়ে গেছে এবং ওদিকের সেই বেরবার বন্ধ দরজাটা খোলা।

উল্লাসে "হুর্‌রে" বলে চীৎকার করে উঠল অমরনাথ। কিন্তু কি করে এমন অসম্ভব সম্ভব হোল? ওদিকে কঙ্কালগুলো দেখেছে মীনু, হীরু। ভয়ে ওরা অমরকে জড়িয়ে ধরেছে। অমরের আর ভয় হোল না—তার মনে হোল—তার সেই পূর্ব্ব পুরুষ যেন দরজা খুলে দিয়ে গেলেন। নিশ্চিন্ত মনে সে মীনু, হীরুর হাত ধরে বেরিয়ে পড়ল সে-ঘর থেকে। সটান সুড়ঙ্গ পথ বেয়ে এসে পৌঁছল ঘাটের নীচের পাথরের পিছনে কিন্তু সে দরজাটা ওরাই সেদিন বন্ধ করে রেখে গেছে। বাইরের আলোর

এত কাছে এসেও অমর মুক্তি পাবে না? হায় ভগবান! নিরাশায় বসে পড়ল অমরনাথ সেইখানেই। মীনু তার হীরু প্রায় আধমরা হয়ে পড়েছে। সারাটা দিন উপোস—এক ফোঁটা জলও নাই—কী করবে আর অমরনাথ। নিক—ঐ সর্বনেশে সিদ্ধেশ্বরই খেয়ে নিক তাদের!

অমরের কোলের ভেতর মাথা গুঁজে হীরু করুণ কণ্ঠে বল্লে,—জল খাবো দাদা! মীনু বললে—জল পিপাসা আমারও পেয়েছে—কিন্তু জল তো নেই আর। অমরের বুকের ভেতর কান্না ঠেলে বেরুতে চাইছে। কোন রকমে নিজেকে স্থির করে সে ভাবল—পাশের ঐ কূয়োতে যাবার সুড়ঙ্গটাতে পুকুরের জল এসেছে, ঐ জলই খাওয়াবে ওদের।

আবার সে ওদের নিয়ে ভিতর দিকে আসতে লাগল। কিন্তু সে জল তো ভয়ঙ্কর অস্বাস্থ্যকর হবে—তা হোক, এমনিই তো মরতেই বসেছে, জল না খেলে কতক্ষণ বাঁচবে ওরা আর!

অমরনাথ সুড়ঙ্গের কড়াটা ধরে টান দিল—দরজাটা খুলতেই একটা বিশ্রী গন্ধ নাকে লাগল ওর। কত কালের পচা কতকি ধুয়ে জলটা এসেছে—সে জল খেলে আর বাঁচতে হবে না। যতক্ষণ পারে—থাক—। শেষে যা হয় করা যাবে। অমরনাথ আবার সেই কঙ্কালের ঘরেই ফিরে যাবে। ফিরে যাবে সেই পুঁথির ঘরে— সেখানে শোবার যায়গা আছে, শুইয়ে দেবো মীনু, হীরুকে—শুয়ে আরাম করেই মরবে ওরা তিনজনে। সাধক সিদ্ধেশ্বরের মনোবাসনা পূর্ণ হোক।

অমর এগুলো। মীনু-হীরু যেন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছে।

অমর কঙ্কালের ঘর পেরিয়ে সুড়ঙ্গ ধরে বরাবর ঠিক আনলো ওদের। এইবার সেই পুঁথিঘরের নীচের মূর্ত্তির মাথায় এসেছে —কিন্তু কই মূর্ত্তিটা! নীচে হাত চার গর্ত্ত, আর উপরে হাত সাত-আট ছাদ ওয়ালা একটা কূয়ো। বেরুবার কিছুমাত্র উপায় নাই। মূর্ত্তিটা উপরে উঠে গেছে। কেঁদে ফেলল অমরনাথ। এই সুড়ঙ্গের মধ্যে—না হয় ঐ কঙ্কালের ঘরে কঙ্কাল হয়ে থাকতে হবে তাদের। মীনু হীরুকে কোলে জড়িয়ে এবার সে অজস্র চোখের জলে ভিজিয়ে দিল। চল বোনটি—ঐ কঙ্কালের ঘরেই শুয়ে থাকবো। এমন করে দাঁড়িয়ে মরার থেকে সেই ভালো। আবার ফিরে আসছে অমরনাথ। কে যেন উপরের ঘরটা থেকে ডাকছে— শব্দও হচ্ছে খুব। আওয়াজ শোনা যাচ্ছে, কথা বোঝা যাচ্ছে না। অমর বার বার ডেকে বলল—মূর্ত্তিটার পিঠে লাথি মারুন। আপনি যেই হোন, মূর্ত্তিটার পিঠে লাথি মারুন—দোহাই আপনার!

বলেই অমরনাথ যেই সরে গেছে সুড়ঙ্গের মধ্যে—মূর্ত্তিটা হড়াৎ করে নীচে নেমে এল—আর একটু হলেই অমর ওর তলায় পিষে যেত। সর্ব্ব রক্ষে—ভগবান!

*　　　*　　　*　　　*

মিঃ শিকদার সেই এক ফালি রাস্তার উপর ক্রমাগত পায়চারী করছেন আর ভাবছেন—ঐ বন্ধ দরজার ওপারে হয়ত অমর-মীনু-হীরু মৃত্যুপথের যাত্রী, আর এ পারে তিনি এই মসৃণ রাস্তাটুকুতে মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করছেন। কে জানে অমরের বাবা কোথায় উপে গেলেন।

হঠাৎ একটা শব্দ হোল—টর্চ্চের বোতাম টিপলেন তিনি। দেখলেন, কঠিন লোহার কবাট জোড়াটা অকস্মাৎ খুলে গেছে। এ কি ভৌতিক কাণ্ড নাকি! তৎক্ষণাৎ ঘরে ঢুকে বুঝতে পারলেন, এই ঘরে মানুষ ছিল কিছুক্ষণ আগেই, কিন্তু কোথায় তারা!

মেঝের মাঝখানে একটা মস্ত বড় মূর্ত্তি—চারদিকে লোহার আলমারী চারটা, তার মধ্যের পুঁথি কে যেন ওলট পালট করে রেখে গেছে। মানুষ নাই, মানুষ বেরিয়ে যাবার আর কোন পথও নেই। কোথায়, কোন দিকে গেল তবে তারা!

অমরের মত আলমারীগুলোতেই দরজা আছে ভেবে তিনি লাথি মারতে লাগলেন। কিন্তু কোনটাই এতটুকু নড়ল না—আলমারিই ওগুলো, ওতে কোনরকম কৌশল নেই—বেশ বুঝলেন মিঃ শিকদার। এ অবস্থায় কি করা কর্ত্তব্য, ভেবে পাচ্ছেন না তিনি। শেষে ভাবলেন, অমররা যদি কোন গুপ্ত পথ দিয়ে বাইরে বেরিয়ে থাকে তো ভালই, তাঁর যা হয় হবে—কিন্তু যদি না বেরুতে পারে, তাহলে কি হবে? অনেকক্ষণ একটা মোটা

চুরুট টানলেন তিনি একটা কোচে বসে বসে। পুঁথিগুলো নাড়াচাড়া করলেন কিছুক্ষণ, সব তন্ত্রধর্মের প্রাচীন পুঁথি। বিরক্ত হয়ে শেষে ঘরের প্রত্যেকটি কোচ, কুর্সি, এমন কি টানা পাখাটা পর্য্যন্ত টেনে দেখলেন—যদি কোথাও কোন গুপ্ত দরজা পাওয়া যায়। নাঃ, কোন উপায়ই হোল না।

বাইরে বেরিয়ে আবার সেই লিফ্‌ট্‌টার কাছে আসবেন ভাবছেন, এমন সময় কান্নার স্বর শুনতে পেলেন, ঐ ঘরে—ঘরের মেঝেতে। হীরু, মীনু, অমরও কাঁদছে। জোর গলায় ডাক্‌ দিলেন—অমর, অমর!

মেঝের নীচে থেকে অমর বললে—'লাথি মারুন'—আবার শুনতে পেলেন মিঃ শিকদার—"মূর্ত্তির পিঠে লাথি মারুন—" শুনেই মিঃ শিকদার প্রচণ্ড লাথি মারলেন মূর্ত্তিটার পিঠে। মূর্ত্তিটি মাটির নীচে নেমে যেতেই আলো ধরলেন তিনি গর্ত্তের মধ্যে—প্রথম মীনুকে তারপর হীরুকে কাঁধে করে তুলে শেষে উঠে এল অমর। মিঃ শিকদার সানন্দে ওদের আদর করে চুমা দিয়ে বেরিয়ে আসতে যাবেন—সামনের দরজা বন্ধ হয়ে গেছে। লিফ্‌টের কাছে যাবার পথ নাই।

ক্রুদ্ধ হতে গিয়ে কান্না পেয়ে গেল তাঁর এবার। কি এবার করবেন তিনি? মূর্ত্তিটিকে উপরে তুলতে পারলে দরজাটা খোলে, কিন্তু তুলবার কোন উপায়ই তো জানা নেই।

—ওদিকে তুমি পথ পেলে না অমর?—শুধালেন মিঃ শিকদার।

—না জ্যেঠামশাই—করুণ কণ্ঠে বলল অমর।

এই অপোগণ্ড শিশুগুলিকে নিয়ে এখন মিঃ শিকদার মাথায় কুড়ুল মারবেন কি না ভাবছেন—মীনু বলল—ওই দিকে তুমি চলো বাবা, তুমি একটা উপায় বার করতে পারবে।

নিরুপায় শিকদার মশাই আবার মীনু-হীরু-অমরকে মূর্ত্তির মাথায় নামিয়ে সুড়ঙ্গে ঢুকালেন এবং নিজেও নেমে এলেন। সেই পূর্ব্বের পথ ধরেই চলতে লাগলেন ওঁরা। মিঃ শিকদারের হাতে টর্চ্চের তীব্র আলো। খানিকটা এসেই দেখলেন—ভাঙা জালাটার খোলামকুচিগুলো পড়ে আছে আর জালাটা বসানো ছিল যে-কাঠের চৌকীটার উপর, সেটা যেন রাস্তাটা আগলে আছে।

অমরকে জিজ্ঞাসা করলেন তিনি, জালাটা কি করে ভেঙেছে। অমর ব্যাপারটা আগাগোড়া বলল তাঁকে—! কৌটাটাও দেখালো। মিঃ শিকদার ছোট দরজাটার মাঝের চৌকীটা একটু সরিয়ে দেবার জন্য যেই-না একটু চাপ দিয়েছেন, খটাং করে সেটা কাৎ হয়ে গেল—আর একটা প্রচণ্ড শব্দ হোল। কী ব্যাপার ঘটল কিছু না বুঝে মিঃ শিকদার ওদের পার করে সেই কঙ্কালের ঘরে এসে দেখলেন—যেখানে যেমন ছিল সব ঠিক আছে। কোথায় কি শব্দ হোল তাহলে!

সেদিনকার দেখা সেই আসনটা মেঝের সঙ্গে মিলে আছে দেখে তিনি ওটা পা দিয়ে নাড়া দিতে লাগলেন—একটু জোরে চাপ দিতেই সেটা মাটীর নীচে নেবে গেল এবং বেরুবার বড় দরজাটি বন্ধ হয়ে গেল। ওদিকে দেওয়ালের সেই ছোট্ট

ফাঁক দিয়ে দেখলেন মিঃ শিকদার,—জলচৌকিটা সোজা হয়ে উঠল। ঐ চৌকীটার সঙ্গেই তাহলে যোগ আছে এর। মিঃ শিকদার ত্বরিতে গিয়ে চৌকীটা আবার বাঁকা করলেন—হাঁ, ঠিক আসনটা উপরে উঠলো, সঙ্গে সঙ্গে দরজাও খুললো।

কিন্তু এই দরজাটা খুললেই তো আর বাইরে যাওয়া যাবে না। ওদিকে ঘাটের পথ বন্ধ আছে। মিঃ শিকদার দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছেন, হঠাৎ তাঁর নজরে পড়ল সেদিনের সেই ব্রোঞ্জের ফলকটা—"ত্রিবেণী সঙ্গমে অর্দ্ধোদয়ে মুক্তি খুঁজি।"

ত্রিবেণী সঙ্গম, অর্থাৎ তিন দরজার সঙ্গম। এই কঙ্কালের ঘর। আর একটা সেই পুঁথীর ঘর—অন্যটা বোধ হয় সেই সিন্দূক। এই জালা বসানো চৌকিটাই এই ত্রিবেণীর সঙ্গম—অতএব ঐখানেই মুক্তির উপায় হবে। 'অর্দ্ধোদয়' অর্থাৎ ওটাকে আধখানা বাঁকা রাখতে হবে ঠিক আধখানা উদয়ের মত—এই অর্থ পেয়ে মনে মনে খুসী হয়ে উঠলেন মিঃ শিকদার।

অমর প্রত্যেকটি কঙ্কাল থেকে এক টুক্‌রো হাড় ছাড়িয়ে নিচ্ছিল—কি করবে অমর ?—বলতেই সে জবাব দিল—

—মুক্তি পাবার কোন আশা তো নেই জ্যেঠা মশাই—যদি পারেন তো সেদিনকার মত সেই সিঁড়ি দিয়েই চেষ্টা করুন। বেঁচে যদি বেরুতে পারি, তাহলে এই অস্থিগুলো গঙ্গায় দিয়ে সিদ্ধেশ্বরের শ্রাদ্ধ করে তবে জল গ্রহণ করবো।

মিঃ শিকদার—চিরদিন ভূতপ্রেতে অবিশ্বাসী মিঃ শিকদার কিছুই বললেন না। ওঁরা আবার সেই সুড়ঙ্গ পথেই ফিরে এলেন।

চৌকীটা সমান্তরাল হলে কঙ্কালের ঘরে দরজা বন্ধ হয়, আর আসন নেমে যায়, বাঁকিয়ে দিলে আসন উঠে আসে আর দরজা খোলে। ওদিকে পুঁথির ঘরটায় ঠিক ঐ অবস্থা হয় —অর্থাৎ বেরুবার দরজা বন্ধ হয়— মূর্ত্তি মাটির তলায় নেমে যায়। আবার চৌকী বাঁকিয়ে দিলে মূর্ত্তি মেঝের উপর উঠে এবং দরজা খুলে যায়। কাজেই ভাবনায় পড়তে হোল বেশ। মূর্ত্তিটা মেঝের উপর উঠে গেলে সুড়ঙ্গ থেকে বার হয়ে পুঁথির ঘরে যাওয়া অসম্ভব, আবার পুঁথির ঘরে গেলে সে ঘর থেকে বাইরে যাবার দরজা বন্ধ থাকে।

মিঃ শিকদার সিন্দুকটার অবস্থা দেখতে চললেন।— দেখলেন, সিন্ধুকের দরজা অটল হয়ে পড়ে আছে। ত্রিবেণী সঙ্গমের এটা তাহলে একটাও অঙ্গ নয়।

মিঃ শিকদার বললেন—সুড়ঙ্গ বেয়ে আমরা পুঁথির ঘরে গিয়ে তো উঠি, তারপর যা হয় করা যাবে। সে ঘরটা বড় —এবং অন্য কিছু উপায়ও থাকতে পারে। চৌকী সোজা করে মূর্ত্তিকে মাটির তলায় নামিয়ে ওরা পুঁথির ঘরে এসে উঠলেন।

কপালে কাল ঘাম জেগে উঠেছে মিঃ শিকদারের। শেষে তিনি বললেন—অমর—আমি মরি, দুঃখ নাই—আমি ওদিকে গিয়ে মূর্ত্তিটা তুলে দিই—তোমরা দরজা খোলা পেয়ে সেই খাঁচাটা দিয়ে যদি পার তো কোন রকমে উপরে ওঠ গিয়ে।—

—উঠবার উপায় নাই জ্যেঠা মশাই। তাহলে তো তখুনি চেষ্টা করতুম। ও খাঁচা আর উঠবে না।

নিরাশ হয়ে ওঁরা বহুক্ষণ চুপচাপ বসে রইলেন। মুক্তির

উপায় সত্যি নেই। হীরু মীনু মিঃ শিকদারের দুই হাঁটুতে মাথা রেখে ঝিমুচ্ছে। ওদের মুখের দিকে চাওয়া যায় না। ব্যথায় বুক টন্‌টন্‌ করে উঠল মিঃ শিকদারের। ওদিকে অমরনাথ নিরুপায় নির্ব্বোধের মত একটা কোণে মাথা গুঁজে পড়ে আছে। ভাবছে, ঐ শয়তান সিদ্ধেশ্বর কি জন্য যে এই সর্ব্বগ্রাসী বাড়ী তৈরী করেছিল, তা আর জানা হোল না। ওর তৈরী এই ভিটেতে ওরই বংশের শেষ বংশধর অমরনাথ তিলতিল করে শুকিয়ে শুকিয়ে মরে যাবে।

উপরের সিঁড়িতে গিয়ে আবার ঝুলেই পড়বেন নাকি মিঃ শিকদার? ও ছাড়া তো আর উপায় নাই। সে ঘরটায় কতটা জল এখন, কে জানে। তা ছাড়া হীরু মীনু কি দম্‌ রাখতে পারবে অতক্ষণ? কিন্তু আর যখন কিছু উপায় নাই, তখন ঐ পথেই জীবন-রক্ষার শেষ চেষ্টা করবেন ওঁরা। আর মনে হয়, ত্রিবেণীর তৃতীয় পথ ঐটাই।

সময় নষ্ট করা বৃথা ভেবে উঠে পড়লেন মিঃ শিকদার। হীরুকে কোলে নিলেন, সে আর দাঁড়াতে পারছে না। মীনু উৎসাহিত হয়ে বলল—পারবে সে হাঁটতে। অমরের পিছনে নামলো সে। চৌকীটার কাছে এসেই অমর রাগে মারলো একটা লাথি তার উপর। বাঁকা হয়ে গেল চৌকীটা, সঙ্গে সঙ্গে মূর্ত্তিটা ঝড়াং করে উপরে উঠে গেল। মিঃ শিকদার হীরুকে কোলে নিয়ে পিছনে আসছিলেন—হঠাৎ টর্চ্চের আলোটা পিছনে ফেলে সবিস্ময়ে দেখলেন, মূর্ত্তিটা নীচে নেমে এসে তার অবয়ব দিয়ে যে তিন-চার হাত জায়গা দখল করে ছিল সেটা

খালি হয়ে গেছে আর তাঁরা যে-সুড়ঙ্গে ঢুকেছেন তার ঠিক বিপরীত দিকে আর একটা সুড়ঙ্গ চলে গেছে এঁকে বেঁকে কোথায়—কে জানে।

অমরকে ডাকলেন তিনি। আগে দেখতে হবে, এই নবাবিষ্কৃত সুড়ঙ্গপথ তাঁদের কোথায় নিয়ে যায়। আশায় উৎসাহিত আর হোতে পারছেন না ওঁরা—কারণ, এই ভীষণ গোলকধাঁধায় পড়ে আশার ক্ষীণ রশ্মিও মন থেকে মিলিয়ে গেছে। সুড়ঙ্গটা চওড়া মন্দ নয়, একজন মানুষ অনায়াসে যেতে পারে কিন্তু উপর দিকে এত কম উঁচু যে প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে চলতে হচ্ছে! আঁকা-বাঁকা সুঁড়ঙ্গটার মধ্যে কোথায় যে চলেছেন তাঁরা, কে জানে।

হঠাৎ কে যেন মানুষের কণ্ঠে বলে উঠল—কে—কে আলো নিয়ে ?

একি—এ কার কণ্ঠস্বর ? মিঃ শিকদার সাড়া দিলেন—

—আমি—শিকদার। আধ মিনিটের মধ্যেই গিয়ে পৌঁছালেন তাঁরা—দেখলেন, বিবর্ণ, বিষণ্ণ হয়ে বসে আছেন অমরের বাবা অন্তহীন অন্ধকারের মধ্যে।

—কি ব্যাপার! কি করে এলেন আপনি এখানে ?

বহু কষ্টে অমরের বাবা কাত্‌রাতে কাত্‌রাতে বললেন—

—বারান্দায় যখন আপনি আগে আগে যাচ্ছিলেন—আমি ঐ ভাঙা থামটার গায়ে আটকানো পরীটা আলগা হয়ে গেছে, পড়ে ভেঙে যেতে পারে ভেবে, ওটাকে একটু সরিয়ে রাখতে গিয়েছিলাম, যেই না হাত দিয়ে একটু টেনেছি—ওর সেই নাচুনে ভঙ্গীর

হাতখানা দিয়ে আমাকে যেন ঠেলে ভেতরে—ঐ থামটারই ভেতরে ঢুকিয়ে দিল—আর সঙ্গে সঙ্গে এই স্পাইরেলের মত প্যাঁচান সিঁড়িটা দিয়ে পিছ্‌লে এইখানে পড়ে গেছি। ওতে নিশ্চয় স্প্রিং আছে যার টানে আমাকে ঠেলে দিলে। কিছুক্ষণ অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম—জ্ঞান হলে অনেকবার ডাকলাম আপনাকে—কিন্তু আপনি বোধ হয় তখন ওখান থেকে চলে গিয়েছিলেন।

মিঃ শিকদার অমরের বাবার অদৃশ্য হওয়ায় কারণটা বুঝলেন এতক্ষণে। বললেন—সিঁড়িটার ধাপ না থাকলেও আমরা উঠে যেতে পারবো—কিন্তু আপনি!

—আমার কোমরের হাড় বোধ হয় ভেঙ্গে গেছে—দাঁড়াতেই পারছি না।

বহু কষ্টে মিঃ শিকদার আর অমর সেই কুতব-মিনারের মত সিঁড়ি দিয়ে অমরের বাবাকে কাছারী ঘরের দোতালায় আনলেন—হীরু-মীনুও এল। উষার আলো তখন মাটি-মায়ের বুকে ঝল্‌মল্‌ করে উঠেছে।

—ইতি—